শ্রীশ্রীবালেশ্বরী পত্রিকা

শুভ
[illegible]পূর্ণিমা তিথি
২[illegible]২৪

শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ

"জাগরণে যারে দেখিতে না পাই
থাকি স্বপনের আশে,
ঘুমের আড়ালে যদি দেখা দেয়,
বাঁধিব স্বপন পাশে।
এত ভালবাসি, এত যারে চাই,
সদা মনে হয় সে যে কাছে নাই;
যেন এ আমার আকুল আবেগ,
তাহারে আনিবে ডাকি,
দিবস রজনী আমি যেন কার আসার আশায় থাকি।"

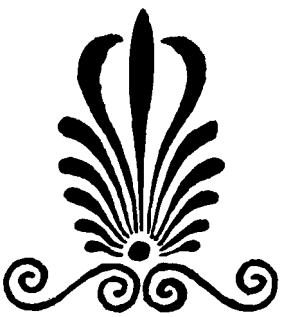

পিতৃদেব ৺রমেন ভট্টাচার্য্য ও মাতৃদেবী ঁসুমিত্রা ভট্টাচার্য্যকে স্মরণে রেখে

শ্রীশ্রীগুরুচরণাশ্রিত—
নীলাঞ্জন, সোহিনী, অঙ্কিত ও আরভ্
মুম্বাই

শ্রীশ্রীবালেশ্বরী পত্রিকা

৬৩ তম বর্ষ ● শুভ গুরুপূর্ণিমা ১৪৩১ সন ● দ্বিতীয় সংখ্যা

সেক্রেটারী: শ্রী সুরজিৎ দে

সম্পাদিকা: শ্রীমতী কনিকা পাল

শ্রীশ্রীমোহনানন্দ সমাজ সেবা সমিতি কর্তৃক প্রকাশিত

এ.ই. ৪৬৭ সল্টলেক সিটি, কলকাতা-৭০০ ০৬৪

ফোন: ২৩২১-৫০৭৭/৫১২৩, মোবাইল: ৮০১৭২২৭০৯৯

E-mail: sreesreemohananandatrust@gmail.com / mohananandasamaj@gmail.com

মুদ্রণ: জয়শ্রী প্রেস, ৯১/১বি বৈঠকখানা রোড, কলকাতা ৭০০০০৯। ফোন: ৯৮৩০১৮৮৭২৪

সূচীপত্র

সতাং প্রসঙ্গ	গুরুকরণ ও মন্ত্র দীক্ষা	৩১
বালানন্দ কথামৃত (সরলাবালা মিত্রের সৎসঙ্গ)	অনুবাদক শ্রীগুরুদাস শর্মা	৩৩
মার্গ ও মিলন	শ্রদ্ধেয় বিভবানন্দ ব্রহ্মচারী	৩৬
নীল বসন	শ্রীমতী অরুণিমা বসুমল্লিক	৩৯
গীতার মর্ম	শ্রীদেবপ্রসাদ রায়	৪০
দ্বন্দ্বাতীত	শ্রীমতী মেখলা দত্ত	৪১
স্মৃতির আলোকে বিগত দিন (৩য় খণ্ড)	শ্রদ্ধেয় সৌরেন্দ্রনাথ মিত্রের লেখা থেকে—	৪২
কাশীতে কয়েকটা দিন	শ্রী সোমনাথ সরকার	৪৫
Amrapali--an epitome of life	--Dilip Kumar Dutta	৪৭
পুণ্য-পরশ-পুলক (১৪শ পর্ব)	শ্রীবসুমিত্র মজুমদার	৪৯
কথা সৎসঙ্গ	শ্রীমতী অনসূয়া ভৌমিক	৫১
"গুরু সাক্ষাৎ পরম ব্রহ্ম"	শ্রীমতী রীণা মুখোপাধ্যায়	৫৩
স্মৃতির পাতা থেকে	শ্রীমতী সোমা মুখোপাধ্যায়	৫৫
বিশ্বজোড়া ফাঁদ যে তোমার	শ্রীগুরুচরণাশ্রিতা কণিকা পাল	৫৭
DURGAPUR CANCER HOSPITAL LIST OF DONORS (FOR THE PERIOD 12/02/2024 to 23/05/2024)		৫৯
স্বার্থ—নিঃশর্ত অগ্রসর (সম্পাদকীয়)		৬০

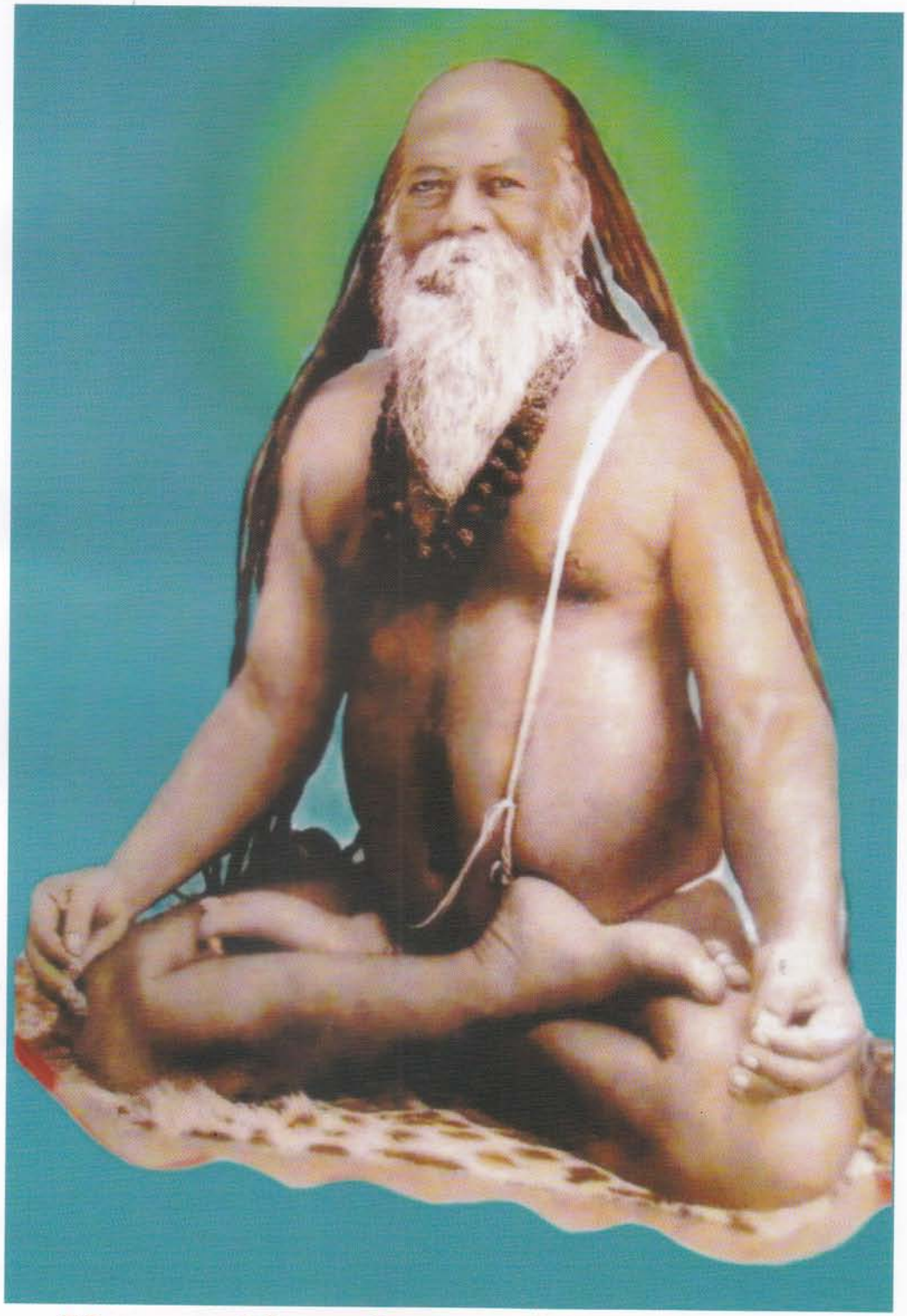

শ্রীশ্রী বালানন্দ ব্রহ্মচারীজীর স্মরণে শ্রী অরূপ সেন ও শ্রীমতী কাবেরী সেনের— সৌজন্যে।

সতাং প্রসঙ্গ

গুরুকরণ ও মন্ত্র দীক্ষা

"এই বেসুরো জীবনে আমরা সুর খুঁজে বেড়াচ্ছি-যাঁরা গানের শিক্ষা করেন তাঁরা যেমন সুর মিলিয়ে দেবার জন্য একজনার সাহায্য নেন;যাঁরা বিজ্ঞানের আশ্রয় গ্রহণ করেছেন তাঁরা যেমন বিজ্ঞানকে জানবার জন্য শিক্ষক খোঁজেন। (দীক্ষার ক্ষেত্রেও তেমনি) এই জন্য শিক্ষা এবং দীক্ষা এ দুটো হোলো একই বস্তু। যে বিষয়ে আমাদের অনভিজ্ঞতা বা অজ্ঞতা রয়েছে, সে অজ্ঞানকে সে অনভিজ্ঞতাকে পরিহার করার জন্য গুরুর প্রয়োজন। যাঁদের প্রতি বিশ্বাস বা শ্রদ্ধা আছে কিম্বা যাঁরা আমার এই অজ্ঞান সরে যাওয়ার পক্ষে সহায়তা করতে পারেন, এইরূপ ভাবে যদি আমার মধ্যে বিশ্বাস হয় এবং শ্রদ্ধা হয় তাহলেই গুরুর প্রয়োজন। এই জন্যে রবীন্দ্রনাথ বললেন—

"সুরের গুরু দাও গো সুরের দীক্ষা,
মোরা সুরের কাঙ্গাল, এই আমাদের ভিক্ষা।।"

আমাদের ভেতর যদি এই কাঙ্গালত্ব ভাব আসে, এই তৃষ্ণা আসে যে আমরা এই অছন্দময় জীবনটাকে ছন্দময় করব; তা হলেই মন্ত্রের প্রয়োজন। মন্ত্রের অর্থই হল শব্দ। সেই শব্দটা যেখানে ছন্দময় হয়েছে, সেটাই মন্ত্র বা ছন্দময় শব্দ।

সব মন্ত্রের আদি হলেন ওঁকার—অকার, উকার, মকার। এই অকার, উকার মকার থেকে বিশ্বজগৎ সৃষ্ট। সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ বলি, জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি বলি, সৃষ্টি, স্থিতি, লয় বলি, সবই এই অকার, উকার মকার। এই ওঁকারটাই হল সব চেয়ে বড় ছন্দ, সিনথেসাইজড শব্দ, সিনথেসাইজড, শব্দটাই ব্রহ্ম। নাম, রূপ, অস্তি, ভাতি ক্রিয়া এই পাঁচটি নিয়ে জগৎ। তার মধ্যে আমরা অস্তি, ভাতি, ক্রিয়া সহজে আয়ত্ত করতে পারি কিন্তু নাম রূপটা আমরা সহজে আয়ত্ত করতে পারি না। এই নামের ভেতর নামী রয়েছেন, মন্ত্রের ভেতর মন্ত্রার্থ চৈতন্য রয়েছেন। যখন আমরা বিগ্রহের পুজো করি বিগ্রহের ভেতরে চৈতন্যের সত্তাকে আমরা স্বীকার করে তার ভেতর প্রাণ প্রতিষ্ঠা করি; (তখন) আমরা মৃত্তিকা দর্শন না করে মৃন্ময়ে চিন্ময় রূপ দর্শন করি। এই জন্যে এ জগতের ভেতরেও;যেটাকে আমরা জড় দেখছি, স্থূল দেখছি, যেটাকে প্রাপঞ্চিক বস্তু বলে গ্রহণ করছি এর ভেতরেও একটা চিন্ময় সত্তা রয়েছে। সেই চিন্ময় সত্তাটাকে শাস্ত্রকারেরা বললেন—

অখণ্ডমণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরম্
তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ।

যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের ভেতরে এই সুরের কাঙ্গালত্ব না হচ্ছে এই সুরের জন্য একটা বাসনা, তৃষ্ণা বা স্পৃহা না জাগছে ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা এই অসার জগতের মধ্যে অছন্দময় জীবনের ভেতর শান্তি খোঁজবার চেষ্টা করি কিন্তু পাই না।

যখন বুঝতে পারব যে এই মর জগতের ভেতরেও একটা অমরত্বের সন্ধান আছে তখন যাঁরা এই অমরত্বের আস্বাদন পেয়েছেন কিম্বা যাঁরা এই মরজগতে থেকেও অমর পথাশ্রয়ী হয়েছেন তাঁদের আমরা শ্রদ্ধা এবং বিশ্বাস সহকারে গ্রহণ করি। আমরা মনে করি তাঁরা আমাদের পথ দেখাতে পারবেন।

এই জন্য গুরু শিষ্য সম্বন্ধ জগতে প্রাচীন কাল থেকে চলে আসছে। কিন্তু বাস্তবিক গুরু এবং শিষ্যের মধ্যে পৃথকত্ব কিছু নেই। কারণ শিষ্যের ভেতর যে চৈতন্যময় সত্তা রয়েছেন গুরুর ভেতরেও সেই একই সত্তা রয়েছেন। তবে আমি সেটা উদ্বোধন করতে পারছিনা তখন বাইরের কারো সহায়তা নিতে হচ্ছে যাঁর দ্বারা এটা সম্ভব হতে পারে। এই জন্য বললেন—

"সুরের গুরু দাও গো সুরের দীক্ষা,
মোরা সুরের কাঙ্গাল এই আমাদের ভিক্ষা।
মন্দাকিনীর ধারা তুষার শুভ্র তারা
যে সুরেতে কানে কানে হল তোমার দীক্ষা।"

এই জগতের ভেতর আমরা কতকগুলি সূক্ষ্মধারা দেখছি আমাদের ওপর যার ছাপ পড়ছে। সুরের মন্দাকিনী ধারা বয়ে চলে যাচ্ছে, তার ভেতর সুরটা রয়েছে আমরা ধরতে পারছিনে। কিন্তু যাঁরা সুরের ভেতর তন্ময়তা লাভ করেছেন, যাঁরা মন্ত্রকে আশ্রয় করে মন্ত্র-চৈতন্য করায় সর্ব্বদা চেষ্টিত রয়েছেন, যাঁরা এই অছন্দময় জগতে সুরের ছন্দতা সন্ধান করেছেন তাঁদের কাছে যদি আমরা আশ্রয় গ্রহণ করি তবে আমাদের ভেতর যে সুরটা চাপা রয়েছে সেই সুরকে, সেই মন্ত্রকে, সেই ঝংকারকে আমরা বাজাতে পারবো। এই জন্য গুরুরও শক্তি থাকা দরকার। তাহলেই তিনি শক্তিপাত করতে পারেন।

আমাদের ভেতর শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস যদি থাকে, তবে একটা চৈতন্যময় বস্তু— যাঁকে আমরা শ্রদ্ধা এবং বিশ্বাস করি— যিনি এই পথে আশ্রিত হয়েছেন, (তাঁর প্রতিও) এইরূপ প্রগাঢ় শ্রদ্ধা বিশ্বাস নিয়ে যদি তাঁর আশ্রয় গ্রহণ করি, তবে আমার মধ্যে যে সুপ্ত ছন্দ রয়েছে, সে জেগে উঠবে। এই জন্য বললেন—

"তোর ভিতরে জাগিয়াকেরে তাহারে বাঁধনে রাখিলি বাঁধিয়া;
আলোর পিয়াসী সে যে গুমরি উঠিছে কাঁদিয়া।"

আমাদের ভেতর এই যে চঞ্চলতা নিজেকে ব্যক্ত করার জন্য সর্বদা চেষ্টিত রয়েছে, আমরা শুধু বাইরের অবলম্বন বা বাতাবরণ অনুকূল পাচ্ছি না বলে সেটাকে জাগাতে পারছি না। তাই কবীর সাহেব বললেন—

"তেরা সাঁই তুঝমেঁ ইহ ঝোপরী তেরা বাস
কস্তুরীকা মৃগ য্যায়সা ফিরতি ঢুঢ়ে ঘাস।"

কস্তুরী-হরিণের নাভি হতে সুগন্ধ আসছে, সে সমস্ত জগৎ খুঁজে বেড়াচ্ছে কোথা সে সুগন্ধ আসছে; মৃত্যুও যদি হয়ে যায়, তবুও সে (তার খোঁজ) পায়না। সে-রকম আমরা যে শান্তি যে আনন্দ খুঁজছি, সেটা বাইরের বস্তু নয়, অন্তরের বস্তু।

বালানন্দ কথামৃত

(সরলাবালা মিত্রের সৎসঙ্গ)

অনুবাদক শ্রীগুরুদাস শর্মা

শ্রীশ্রীগুরুমহারাজ ও শ্রীমতী অনিলা বালা দাসীর সৎসঙ্গ (শ্রীসুরেন বর্মন উকিল মহাশয় ও তাঁর পত্নী অনিলাবালা দাসীর দুটি সন্তান মারা যাওয়ায় শোকসন্তপ্ত হৃদয়ে বড় গুরুমহারাজকে প্রণাম করে অশ্রুমোচন করতে করতে প্রশ্ন করলেন)

অনিলা—বাবা আমি তো পুত্র চাই নি। ভগবান দিলেনই বা কেন আবার কেড়ে নিলেনই বা কেন; এর মর্ম্ম আমায় বুঝিয়ে দিন।

শ্রীগুরু—বাছা, সৃষ্টি রহস্য আমরা বুঝতে পারি না। যে ঈশ্বর আমাদের সৃষ্টি করেছেন, সেই ঈশ্বরই আমাদের পালন করছেন, আবার তিনিই আমাদের সংহার করছেন। ঈশ্বর কেন সৃষ্টি করেন, কেন পালন করেন, আবার কেনই বা সংহার করেন; এ সমস্তই তিনি আমাদের কাছে রহস্যাবৃত করে রেখেছেন। তুমি নিজ বিচার বুদ্ধি দিয়ে রহস্যের দ্বার খুলে দেখে নাও। সৃষ্টি হচ্ছে কিন্তু সংহার যদি না হয় তাহলে ধরাধামে এত মানুষ থাকবার স্থান পাবে না, খাবার পাবে না, বসবাস করবার উপায় থাকবে না। বিষয়টি একবার ভেবে দেখ দেখি, মানুষ, পশুপাখী, কীট-পতঙ্গাদি স্থানাভাবে পিষ্ট হচ্ছে, খাদ্যাভাবে জঠরজ্বালা ভোগ করছে, যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে নিজেরাই নিজেদের মৃত্যু কামনা করছে। কাজেই মৃত্যু অবশ্যই দরকার। জন্মের ন্যায় মৃত্যুও সৃষ্টি রচনারই অঙ্গ।

অনিলা—মানলাম মৃত্যু সৃষ্টি রচনারই অঙ্গ। কিন্তু আমার দুটি সন্তানই গেল কেন? আমার একটি গিয়ে, যার মোটেই যায় নি এমন ব্যক্তির একটি গেলে তো হত।

শ্রীশ্রী গুরুমহারাজ অনিলা বালা দাসীর এই কথা শুনে সরল বালকের ন্যায় হো হো করে হেসে উঠলেন। সদ্য পুত্র শোকাতুরা মায়ের কাছে কোন ব্যক্তি কি হো হো করে হাসতে পারে ? যদি কেহ হাসে তবে সে পাষাণ। কিন্তু গুরুমহারাজ তো পাষাণ প্রকৃতির লোক নন। তিনি যে জীবের দুঃখ দূর করবার জন্য সদাই ব্যাকুল। তবে প্রভু হাসলেন কেন ? হয়ত এই কারণে বালকের হাসিতে মনুষ্য হৃদয় বড়ই শীতল হয়। রোগে, শোকে, দুঃখে মানুষ যতই কাতর হোক না কেন, বালকের সরল হাসিটুকু দেখলে মনে একটু শান্তি লাভ করে। সেইজন্যই বোধ হয় শ্রী শ্রী গুরুমহারাজ বালকের ন্যায় সরল হাসি হেসে শোকসন্তপ্তা মায়ের হৃদয়ে একটু শান্তি দান করলেন। অথবা অন্য কারণও হতে পারে। গুরুমহারাজের জ্ঞানচক্ষুর সামনে জনম মৃত্যুরূপ সৃষ্টি রহস্য একেবারে উদ্ভাসিত হয়ে রয়েছে অথচ আমাদের অজ্ঞানতা হেতু তিনি আমাদিগকে কিছুমাত্র বোঝাতে পারছেন না। কত উপদেশ দিচ্ছেন কিন্তু কোন কিছুই আমাদের হৃদয়ঙ্গম হচ্ছে না। আমাদের প্রতি তাঁর সমস্ত উপদেশই অরণ্যে রোদনের ন্যায় বিফল হয়ে যাচ্ছে। তাই হয়ত তিনি হো হো করে হেসে উঠলেন। প্রকৃতপক্ষে কি কারণে যে তিনি হাসলেন তা তিনিই জানেন।

তবে সরল শিশুর মত তাঁর সেই হাসিটুকুতে ভক্ত- শিষ্যমণ্ডলী যারা সেখানে উপস্থিত ছিলেন সকলেই প্রাণে নির্মল শান্তি লাভ করলেন।

শ্রীগুরু--আচ্ছা অনিলা, ঈশ্বর তোমার দুটি সন্তানই কেন নিলেন? একটি তোমার সন্তান আর একটি অন্য লোকের সন্তান যার বহু সন্তান বর্তমান— এই ভাবে ঈশ্বর কেন নিলেন না; এটাইতো তোমার ক্ষোভ এবং এটাইতো তোমার প্রশ্ন? বেশ বাছা, আমি একটি গল্পের মাধ্যমে তোমার এই প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছি।

যমরাজ ও বুড়ীর গল্প

এক বুড়ীর সাতটি ছেলে ছিল। এক এক করে সাতটি ছেলেই মারা গেল। বুড়ী শোকসন্তপ্ত হয়ে মনে মনে স্থির করল, আমি যমরাজের সংগে দেখা করে জিজ্ঞাসা করব কেন সে আমার সাত- সাতটি ছেলে কেড়ে নিয়ে আমাকে একেবারে নিঃসন্তান করে দিল। আমার দুটি সন্তান নিয়ে অন্য লোকের, যার বহু সন্তান রয়েছে, তার দু চারটে সন্তান নিলেও তো পারত। এইরূপ চিন্তা করে বুড়ী একেবারে যমরাজের কাছে হাজির হয়ে বল্লো, হে ধর্মরাজ, এ তোমার কেমন বিচার? আমার সাতটি পুত্রই তুমি নিয়ে নিলে? যদি আমার দুটি সন্তান নিতে আর অন্যলোকের যার অনেক সন্তান আছে তার থেকে দু চারটে নিতে তাহলে তোমার বিচার ঠিক হোত। বিচার আমাকে বুঝিয়ে দাও নইলে আমি তোমাকে অভিসম্পাত করব। বল্লো মা তুমি আগে একটু সুস্থ হও, পরে তোমার প্রশ্নের উত্তর দেব। ঐ যে সামনে-পুকুর দেখা যাচ্ছে তাতে গিয়ে স্নান কর। ঐখানে একটি কুটিরে অনেক মিষ্টি রয়েছে। ওখান থেকে তোমার ইচ্ছামত মিষ্টি নিয়ে খাও তুমি অনেক দূর থেকে এসেছ। স্নানাহার করে সুস্থ হয়ে এসো, আমি তোমার প্রশ্নের উত্তর দেব। বুড়ী যমরাজের কথামত কাজ করল। পুকুরে গেল, গিয়ে স্নান করে বেশ সুস্থ বোধ করল। পরে কুটিরে গেল। ভেতরে গিয়ে দেখল সেখানে অনেক হাঁড়ি ভর্তি মিষ্টি। কেবল একটি হাঁড়িতে সাতটি মিষ্টি ছিল বুড়ী তখন ভাবল ঐ ভরা হাড়িগুলি কেন ভাঙবো। যে হাঁড়িতে সাতটি মিষ্টি ছিল সেই হাড়ি থেকেই বুড়ী মিষ্টি খেল। পরে কুটিরে গেল। যে হাড়িটাতে সাতটি মাত্র মিষ্টি ছিল দুচারটে মিষ্টির জন্য ভরা হাড়ি ভাঙ্গেনি, যে হাড়িটা ভাঙ্গা ছিল তা থেকেই সে খেল। বুড়ী সুস্থ হয়ে যমরাজের কাছে গিয়ে বল্লো, হে যমরাজ আমি সুস্থ হয়েছি, এখন তুমি আমার প্রশ্নের উত্তর দাও। যমরাজ বল্লো আগে তুমি আমার প্রশ্নের উত্তর দাও, পরে আমি তোমার প্রশ্নের উত্তর দেব। তুমি ভরা হাড়ি থেকে মিষ্টি খাওনি কেন? বুড়ী বল্লো, বাবা আমি ভরা হাড়ি কেন ভাঙ্গব? যে হাড়িটা ভাঙ্গা ছিল তাতে সাতটি মিষ্টি ছিল, আমি তাই নিয়ে খেয়েছি। ভরা হাড়ি ভাঙ্গিনি। যম বল্লো, মা তোমার প্রশ্নের উত্তর তোমার নিজের মুখ থেকেই পেয়ে গেছ। তুমি যেমন ভরা হাড়ি ভাঙ্গোনি, আমিও তেমনি ভরা ঘর ভাঙ্গিনি। আমি ভাঙ্গা ঘরই আবার ভাঙ্গি।

যদিও এই দৃষ্টান্তের ক্ষুদ্র গল্পটির যুক্তিযুক্ত কোন মানে হয় না তথাপি একেবারে কিছু না বলেও উড়িয়ে দেওয়া যায় না। সৃষ্টি রহস্য দেখলে বেশ বোঝা যায় ভাঙ্গনের দিকেই বেশী করে ভাঙ্গতে থাকে, গড়ার দিকে বড় একটা ভাঙ্গে না। কোন ব্যক্তির সংসার যখন গড়ে ওঠে তখন তার অর্থ বিত্ত পুত্র কলত্র যশ মান সবই থাকে কিন্তু যখন সে ভাঙ্গার মুখে পড়ে তখন দেখা যায় তার পুত্র বিয়োগ স্বজন-বিয়োগ অর্থনাশ বিত্তনাশ শরীরে ব্যাধির আক্রমণ সব যেন এক সংগেই আসে। জানিনা এই ভাঙ্গাগড়া বিধাতার

কোন আইনে হয়ে থাকে।

শ্রীগুরু—বাছা অনিলা, তোমাকে এই যে গল্পটি বললাম তুমি কি তার ভাবার্থ বুঝতে পেরেছ ?

অনিলা—হ্যাঁ মহারাজ, পেরেছি। এইটুকু বুঝতে পেরেছি যে ব্যবহার ক্ষেত্রে আমরা যেমন ভাঙ্গা জিনিষটি থেকেই খরচ করে থাকি, আস্ত জিনিষটি ভাঙ্গি না, যমরাজও তেমনি একবার যার ঘর ভেঙ্গে পুত্রটিকে নিয়ে যান তারই ঘর থেকে বার বার নিতে থাকেন, অন্যের ভরা ঘর সহজে ভাঙ্গেন না। আপনার এই উপদেশ শুনে আমি মনে কিছুটা শান্তি পেলাম।

শ্রীগুরু—বাছা, কিছু শান্তি কেন, পরিপূর্ণ শান্তি হওয়া উচিত। তোমার প্রতি আমার উপদেশ, মা তোমরা সংসারে 'ঝি' হয়ে থেকো, গৃহিনী হতে যেও না। ঝি মনিবের পুত্রকন্যা পালন করে, মনিবের গৃহের সমস্ত কাজকর্ম করে ; কিন্তু সে সব কিছুই মমত্বশূন্য হয়ে করে। যদি তুমি ঝিকে কিছু জিজ্ঞাসা কর, তবে সে বলবে;আমার ছেলে, আমার মেয়ে, আমার বাড়ী কিন্তু মনে মনে সে ঠিক জানে আমার কিছুই নয়;সবই মনিবের। বাছা অনিলা, পরমাত্মাদেব হলেন মনিব। তোমার পুত্রকন্যা বাড়ীঘর সব কিছুই পরমাত্মাদেবের। তুমি কেবলমাত্র তাঁর ঝি সুতরাং ঝিয়ের ন্যায় তুমি পুত্রকন্যা পালন করবে, গৃহকর্ম সব কিছু করবে, কিন্তু মনের ভিতরে সর্বদা এই ভাবটি রাখবে আমার কিছুই নয়, সব কিছুই আমার মনিব পরমাত্মাদেবের। তাঁর ছেলে তিনি নিয়েছেন, এতে তুমি দুঃখ করছ কেন ? দেখ বাছা, এই রকম আরও একটি দৃষ্টান্ত আছে। যেমন মুটে অপরের মোট বহন করে তোমরাও ঠিক তেমনি ভগবানের মোট বহন করছ। যার দুটি সন্তান তার মাথায় দুই মণ বোঝা, আর যার দশটি সন্তান তার মাথায় দশ মণ বোঝা রয়েছে বুঝতে হবে। মুটের যেমন ক্ষমতা তার মাথায় বোঝাও সেইরূপ দেওয়া হয়। পরমদয়াল ভগবান তোমার মাথার ভার হালকা করবার জন্যই তোমার মাথার উপর থেকে দুই মণ বোঝা নামিয়ে নিয়েছেন। তুমি এখন হালকা হয়ে গেছ, তোমার তো আরাম বোধ করা উচিত। তোমার দুটি পুত্র। ভগবান তুলে নিয়েছেন অর্থাৎ কিনা তোমার দুই মণ বোঝা কমিয়ে দিয়েছেন। দুই পুত্রকে লালন পালন করতে তোমার কতই না খাটুনী হোত, কতই না দুশ্চিন্তা হোত। এখন এই সব কিছু থেকে ভগবান তোমাকে ছুটী দিয়েছেন। দেখ বাছা, এখন তোমার দুই মণ ভার কমে গেছে, তবে তুমি দুঃখ করছ কেন? আচ্ছা তোমাকে আরও একটি দৃষ্টান্ত বলছি, শোন। একটি লোকের একটি পুত্র ছিল। পুত্রটি একবার দার্জিলিং গেল। সেজন্য কিন্তু তার মায়ের মনে কোনরূপ দুঃখ ছিল না। মা বলত আমার ছেলে দার্জিলিং গিয়েছে, ভাল দেশেই তো গিয়েছে। সেখানে আমার পুত্র বেশ ভাল আছে। এতে আমি মনে বেশ শান্তি ও আনন্দ বোধ করছি। দেখ অনিলা, তোমার পুত্র তো স্থূল শরীর ছেড়ে সূক্ষ্ম শরীরে গিয়েছে, ইহকাল ছেড়ে পরকালে গিয়েছে। দার্জিলিং যাওয়ার মতনই দেশান্তরে রূপান্তরে গিয়েছে, তবে তুমি দুঃখ কর কেন? পুত্র দার্জিলিং গেলে দুঃখ হয় না।

(ক্রমশঃ)

মার্গ ও মিলন

শ্রদ্ধেয় বিভবানন্দ ব্রহ্মচারী

"যথা নদ্যঃ স্যন্দমানাঃ সমুদ্রে
অস্তং প্রায়ান্তি নামরূপে বিহায়।"

নদী সকল নানা পথে ধাবিত হইয়া যেমন সমুদ্রে সম্মিলিত হইলে তাহাদের নাম ও আকার বিলীন হইয়া যায়, সেইরূপ সাধক যে কোন সাধন মার্গ অবলম্বন করিয়া সাধনা করিলে এক অদ্বিতীয় পরমেশ্বরকেই প্রাপ্ত হয়েন, তখন সাধনার পৃথক সত্তা থাকে না। যতদিন পরমাত্ম-সাক্ষাৎকার না হয়, ততদিন সাধন মার্গের ভিন্নতা বিদ্যমান কিন্তু পরমাত্মার অপরোক্ষ অনুভব হইলে সমস্ত সাধনার একাকারত্ব সংঘটিত হয়।

শিবমহিম্নঃ স্তোত্রে ভক্ত শ্রেষ্ঠ মহাশৈব পুষ্পদন্ত বলিলেন,

"রুচীনাং বৈচিত্র্যাদৃজুকুটিল/জুষাং
নৃনামেকো গম্য স্ত্বমসি পয়সামর্ণবইব"

নিজ নিজ সংস্কারানুযায়িণী প্রবৃত্তির পার্থক্য বশতঃ সরল কুটিল নানা পথ অবলম্বনকারী মানবগণের তুমিই একমাত্র লক্ষ্যস্থল; যেমন নদী সকলের লক্ষ্য মহাসমুদ্র।

মুক্তি সাধনার পথ অনেক কিন্তু সকল পথের সঙ্গমস্থল এক অদ্বিতীয় পরমেশ্বর। শাস্ত্রে বহুবিধ সাধনা পদ্ধতি নির্দ্দিষ্ট থাকিলেও মুখ্য হইল কর্ম্মমার্গ', ভক্তিমার্গ, যোগমার্গ ও জ্ঞানমার্গ। বস্তুতঃ যোগ, সাধনা অন্যান্য সমস্ত সাধনার সহিত অবিচ্ছেদ্যরূপে সংশ্লিষ্ট। যোগের সাহায্য ব্যতীত কর্ম, ভক্তি ও জ্ঞান সাধনা ফলপ্রসূ নয়। যোগ সাধনাতে সংশ্লিষ্ট কর্ম্ম ভক্তি ও জ্ঞানকে কর্ম্মযোগ, ভক্তিযোগ ও জ্ঞানযোগ বলা হয়। প্রকৃতপক্ষে সর্বপ্রকার সাধনাই যোগের কাছে ঋণী। যোগ-সম্বন্ধ শূন্য কর্ম্ম, বাহ্যাড়ম্বরমাত্র, যোগরহিত ভক্তি ভাবাবেগ মাত্র ও যোগ বর্জ্জিত জ্ঞান পাণ্ডিত্য বিজৃম্ভণমাত্র। যোগ পরশমণি, তাহার স্পর্শে সমস্তই হিরণ্ময় হইয়া যায়। জল যেরূপ বর্ণের সহিত যুক্ত হয়, তাঁহার আকার প্রাপ্ত হয় সেইরূপ যোগও যাহার সহিত যুক্ত হইবে সেই নামেই অভিহিত হইবে। অবশ্য যোগ সাধনার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব বিদ্যমান- এইজন্য যোগ নিরপেক্ষসাধনা। কিন্তু কর্ম্ম, ভক্তি ও জ্ঞান, যোগ সম্পর্ক শূন্য হইলে প্রাণহীন জীব দেহের ন্যায় উদ্দেশ্য সাধনে অসমর্থ।

গীতায় যোগ শব্দের অর্থ প্রতিপালন করা হইল "যোগঃ কর্ম্মসু কৌশলম্। এই স্থলে "কর্ম্মসু

এই কর্ম্মপদে বহুবচন থাকায় সর্ব্ব প্রকার সাধনার বিশেষ বিশেষ কৌশলকেই যোগ বলা হইল। কর্ম্ম সাধনায় নিরাসক্তি ও নিরহঙ্কারত্ব থাকিলে কর্মযোগ; কর্ম্মে নিরাসক্তি ও অভিমানশূন্যতা রূপ কৌশলই যোগ। ভক্তি সাধনার কৌশলটি দেখানো হইল; 'ভক্ত্যা ত্বনন্যয়া শক্য অহমেবং বিধোহর্জ্জুন।" "মাঞ্চ যোহব্যভিচারেণ ভক্তিযোগেন সেবতে"— ভক্তির অনন্যত্ব যা অব্যভিচরিতত্ত্বই ভক্তিযোগ অর্থাৎ যে

ভক্তিতে আরাধ্য ইষ্ট ব্যতীত অন্য কিছু উপলব্ধ হয় না তাহাকেই ভক্তির কৌশলরূপ যোগ বলা হইল।

চৈতন্যচরিতামৃতকার পরাভক্তি অর্থাৎ ভক্তিযোগের দৃষ্টান্তে দেখালেন যে "কৃষ্ণময়ী কৃষ্ণ যার অন্তরে বাহিরে। যাঁহা যাঁহা নেত্র পড়ে তাঁহা কৃষ্ণ স্ফুরে।

জ্ঞানের কৌশলটি প্রদর্শিত হইল; "বাসুদেব সর্ব্বমিতি" সবই বাসুদেব—। আধার বাসুদেব, আধেয় বাসুদেবন, জগতের সব কিছুই বাসুদেব। "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম"—চরাচরবিশ্ব প্রপঞ্চ সব কিছুই ব্রহ্ম। জ্ঞান ও জ্ঞেয় পদার্থের বিষয়বিষয়ীরূপ ভেদভাব বিনষ্ট হইয়া জ্ঞানের অখণ্ডস্বরূপ কৌশলই জ্ঞানযোগ!

এই যোগত্রয়ীর মধ্যে দুরন্ত কলিকবলিত জীবের পক্ষে-ভক্তিযোগই পরম শ্রেয়স্কর ও সহজ সরলমার্গ। কারণ, ভক্তিযোগে বর্ণ বিচার, আশ্রম বিচার, স্ত্রী পুরুষ বিচার যোগ্যাযোগ্য বিচার নাই। পতিত ভ্রষ্ট কুলত্যাগী সকল ব্যক্তির সমভাবে অধিকার বিদ্যমান। এই ভক্তিযোগ সর্বপ্রকার সঙ্কোচ মুক্ত। জাহ্নবী জলাবগাহনে যেমন সকলের সম অধিকার, সমান ফল, সমান গতি উচ্চ নীচে ভেদ নাই ভক্তিযোগও তদ্রূপ। গীতায় শ্রীভগবান্ সুস্পষ্ট ভাষায় কহিলেন;

"অপি চেৎ সুদুরাচারো। ভজতে মামন্য ভাক্।
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্ ব্যবসিতো হি সঃ।।"

যদি অত্যন্ত দুরাচার ব্যক্তিও আমাকে অনন্তচিত্তে ভজনা করে;তবে তাহাকে সাধু বলিয়া জানিবে। যেহেতু সে ভক্তিযোগ অবলম্বন করিয়া যথার্থ বস্তুকে নিশ্চিতভাবে আশ্রয় করিয়াছে। অন্যত্র দেখা যায়

"মাং পার্থ ব্যপাশ্রিতা যেহপি স্যুঃ পাপযোনয়ঃ।
স্ত্রিয়ো বৈশ্যাস্তথা শূদ্রা স্তেহপি যান্তি পরাং গতিম্।।

ভক্তি যোগাবলম্বনে বেদ বহির্ভূত স্ত্রীলোক, মিথ্যাপ্রযুক্ত ক্রয়বিক্রয়দুষ্ট বৈশ্য তপস্যা, যজ্ঞ স্বাধ্যায় বিহীন নীচ কর্ম্ম শূদ্রও পরমাগতি প্রাপ্ত হইবেন। এত বড় মহতী বাণী শ্রীভগবানের মুখেই শোভা পায়। এইজন্য ভক্তিযোগ সার্ব্বজনীন পরম ধর্ম।

ভক্তির স্বরূপ বর্ণনা করা হইল-

"শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনম্।
অর্চ্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম্।।"

ভগবৎ কথা শ্রবণ, হরি সঙ্কীর্ত্তন, ঈশ্বর চিন্তন ঈশ্বরবিগ্রহের শ্রীপাদ পদ্মে সেবা বিধান, গন্ধ পুষ্পাদির দ্বারা পূজন, নানাবিধ স্তোত্র পাঠ, নিজেকে ভগবানের দাস ভাবনা, ভগবানের সুখে দুঃখে সম্পদে বিপদে বন্ধু বুদ্ধি শ্রীভগবানে সর্ব্বতোভাবে আত্ম নিবেদন ইহাই নবধা ভক্তি। নবধা ভক্তির মধ্যে আত্মনিবেদনই সর্ব্বশ্রেষ্ঠাভক্তি।

গীতায় শ্রীভগবান্ আত্মনিবেদনের স্বরূপটি প্রকাশ করিয়া ভক্তিপ্রবর অর্জ্জুনকে বলিলেন--!

"যৎ করোষি, যদশ্নাসি, যজ্ঞ হোবি দদাসি যৎ।
যং তপস্যাসি কৌন্তেয় তৎকুরুত্ব মদর্পণম্।।"

হে অর্জ্জুন! তুমি যাহা করিতেছ, যাহা ভোজন করিতেছ, যাহা হোম করিতেছ, যাহা দান করিতেছ, যাহা তপস্যা করিতেছ, তাহা আমাকে সমর্পণ কর। জীব যাহা কিছু শুভাশুভ কর্ম করিতেছে; তাহা ভগবানই করাইতেছেন; এই বুদ্ধিযুক্ত হইয়া শরণাগতি গ্রহণ করাই আত্মনিবেদন। সেই জন্য প্রাতঃ পঠনীয় স্তোত্রে বলা হইল—

"ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদিস্থিতেন
যথা নিযুক্তেহস্মি তথা করোমি।"

যে ইন্দ্রিয় দ্বারা জগদদর্শন করি, সেই ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতা হে প্রভো! তুমি আমার হৃদয়ে থাকিয়া যেভাবে আমাকে নিযুক্ত করিতেছ আমি তাহাই করিতেছি।

পূর্ব্বোক্ত সাধনাসমূহে যোগীর যিনি ঈশ্বর, জ্ঞানীর যিনি ব্রহ্ম, কর্ম্মযোগীর যিনি কর্ম্মফলদাতা যজ্ঞেশ্বর শ্রীহরি, ভক্তের কাছে তিনিই ভগবান। এই শব্দটিতে যে অর্থ-গাম্ভীর্য্য, তত্ত্ব মাধুর্য ও স্বরূপসত্তা বিদ্যমান, তাহা অনুধাবন করিয়াই ভক্তসাধক বিশ্বপতিকে ভগবান বলিয়া ডাকিতেছেন।

"ঐশ্বর্য্যস্য সমগ্রস্য বীর্যস্য যশসংশ্রিয়ঃ।
জ্ঞানবৈরাগ্যয়োশ্চৈব যন্নাং ভগ ইতি স্মৃতঃ।।"

সম্পূর্ণ ঐশ্বর্য্য, সম্পূর্ণ শক্তি, সম্পূর্ণ কীর্ত্তি, সমস্ত সৌন্দর্য, সমস্ত জ্ঞান ও সমস্ত বৈরাগ্য এই ছয়টিকেই ভগ শব্দ বলা হইল। পরমেশ্বরে এই ছয়টি বস্তু পরিপূর্ণরূপে বিদ্যমান; তাই তিনি ষড়ৈশ্বর্য্যশালী। বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে শ্রীভগবান ব্যতীত এই ছয় ঐশ্বর্য্য বা ভগ অন্যত্র কোথাও নাই। ভগবানই সম্পূর্ণ সৌন্দেৰ্য্যের আধার হেতু তিনি মদনমোহন। ভক্তিযোগে উপাসনা করিতে করিতে ভক্ত সর্ব্বকামনা মুক্ত হইয়া যান। কামনাকে ত্যাগ কবিবার জন্য কঠোর যম নিয়ম তপস্যার পৃথগ্‌ভাবে এইস্থানে প্রয়োজন নাই।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যোগ সাধনায় যোগীর যিনি ঈশ্বর, জ্ঞানীর যিনি ব্রহ্ম, কর্মীর যিনি ফলদাতা পরমাত্মা, ভক্তের কাছে তিনি উপাস্য ভগবান। বস্তু এক ও অভিন্ন, যিনি যেভাবে চাহেন, তাঁহার কাছে তিনি তাহাই। যেমন সাধনমার্গের বিভিন্নতা সত্ত্বেও সাধ্য বস্তুর একত্ব ও অভিন্নত্ব শাস্ত্রসিদ্ধ সেইরূপ সাধনপথগুলি ভিন্নরূপে প্রতীয়মান হইলেও ভক্তিযোগে সকলেই সম্মিলিত হইয়াছে। তাই যোগদর্শনে বলা হইল "ঈশ্বরপ্রণিধানাদ্বা।" অর্থাৎ ঈশ্বর প্রণিধানরূপ প্রেমবিশেষাত্মক ভক্তিযোগের দ্বারাও যোগ-লভ্য সমাধি হইয়া থাকে। যোগ সাধনার অনুরূপ সমাধি ভক্তি সাধনাতেও হয়। ইহাই সূত্র তাৎপর্য্য। "ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ" এই গীতবাক্যে "তত্ত্বতঃ" পদটির দ্বারা জ্ঞানমার্গী সাধক "তত্ত্বমসি", বাক্যের অপরোক্ষ অনুভূতিতে যে জ্ঞান লাভ করেন, ভক্তি দ্বারাও সেই জ্ঞান প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহাই বুঝায়। শ্রীমদ্ ভাগবত বলিলেন 'বাসুদেবে ভগবতি ভক্তিযোগঃ প্রয়োজিতঃ। জনয়ত্যাশু বৈরাগ্য জ্ঞানঞ্চ যদহৈতুকম্। ভগবান বাসুদেবে ভক্তিযোগ যদি প্রয়োজিত হয় তাহা হইলে সত্বর বৈরাগ্য ও ব্রহ্মজ্ঞান প্রকাশিত হয়। ভক্তি দ্বারাই ভক্ত যোগীর বৈরাগ্য ও বিষয় বৈতৃষ্ণ্য ও জ্ঞানীর ব্রহ্মানুভূতি লাভ করিতে সমর্থ, পৃথক্ সাধনার প্রয়োজন নাই। ভক্তির বৈশিষ্ট্য এই যে, মোক্ষলাভে জ্ঞানীর ও যোগীর সাধনা যখন শেষ হইয়া যায় কিছুই করিবার নাই, তখনও ভক্তির সাধনা অব্যাহত থাকে। 'ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মৈব ভবতি' ব্রহ্মজ্ঞানী পুরুষ ব্রহ্মস্বরূপ হইয়া যান। জ্ঞান ও জ্ঞেয়র ভেদ থাকে না অতএব জ্ঞান সাধনাও সমাপ্ত। যোগীর ঈশ্বর সাক্ষাৎ করিলেই যোগের পরিসমাপ্তি কিন্তু ভক্তিযোগে মোক্ষ গৌণ হইয়া নিরবচ্ছিন্ন ভজন চলিতে থাকে। ভক্তের ভজনানন্দের কোথাও বিরতি নেই, কোন সীমা নেই; নিত্য নব নব আনন্দ রসধারায় অনন্ত প্রবাহরূপে অখিল সৌন্দর্য্য নিকেতন রসঘন বিগ্রহ শ্রীভগবানকেই পরিক্রমা করে। স্রোতস্বতীর নিজস্ব বেগ যেমন সমুদ্রে স্তিমিত হইয়া যায়, ভক্তিযোগে কিন্তু ভগবৎ সমুদ্রে মিলনের পরেও নিজস্ব গতিধারাটি বিলুপ্ত না হইয়া স্বতন্ত্রভাবেই চলিতে থাকে তাই ভাগবতকার বলিলেন—

পিবত ভাগবতং রসমালয়ম"। আলয়ম লয়ো মোক্ষঃ, আলয়ং মোক্ষপর্য্যন্তম্ অর্থাৎ মুক্তির পরেও

ভাগবত-রস রসিক ভক্তগণ পান করেন।

শাস্ত্রকারগণ কর্ম, ভক্তি ও জ্ঞান এই পথত্রয়ীর মধ্যে অধিকারী ভেদে এক একটি অবলম্বনের নির্দেশ দিয়াছেন। জন্মজন্মান্তরের সংস্কারানুরূপা প্রবৃত্তি ও শ্রদ্ধার অনুসরণ করিয়া জীব স্বাভীষ্ট পথ অবলম্বন করিয়া স্বকীয় লক্ষ্যে উপনীত হইতে পারেন। নিজের হৃদয়বৃত্তির শুদ্ধতা ও ভগবদ- ভাবতন্ময়তা বুঝিতে চেষ্টা না করিয়া যদি কেহ কোন পথের শ্রেষ্ঠত্ব ভাঙিয়া মহাকাঙ্ক্ষায় উচ্চপথে আরোহণ করেন, অথচ তিনি সেই পথের যোগ্য হন নাই তাহা হইলে পরিণামে হতাশা ও আত্মগ্লানি সাধককে কাতর করিয়া তুলে। কারণ, অধিকারী নির্ব্বাচন অত্যন্ত দুরূহ ব্যাপার। যিনি লৌকিক কামনায় আচ্ছন্ন, চিত্ত যার তমঃক্লিষ্ট রাগ দ্বেষদগ্ধ তিনি যদি জ্ঞানমার্গের মহত্ত্ব জানিয়া কর্ম্মের সিঁড়ি না চড়িয়া কেবল উল্লম্ফনে উর্দ্ধ স্থানে উঠিতে চাহেন; তবে স্থানপ্রাপ্ত না হইয়া পতনের সম্ভাবনা যে বেশী তাহা বলাই বাহুল্য।

ক্রমশঃ

নীল বসন

শ্রীমতী অরুণিমা বসুমল্লিক

নীলবসন পরিধানে, নীলাম্বর মোর ধ্যানে
আমি যাব বৃন্দাবন
যেথা কদমতলে বাজায় বেনু, যশোদানন্দন।
যেথায় কৃষ্ণনামের তরঙ্গেতে
ভেসে বেড়ায় রাধা রাধা নাম,
যেথায় নীল যমুনায় করে লীলা
মদন মোহন শ্যাম।
নওলকিশোর করে খেলা, ব্রজের বনে সারাবেলা,
রাখাল বালক চক্ষে হারায়
নিশীথের চাঁদ ঝরে রাঙা পায়ে।
ব্রজনারীর চোখ যে দ্বারে,
ননীচোরা ফিরবে ঘরে
করবে চুরি চতুরালী
বাজিয়ে নুপূর পায়ে।
আমি দুচোখ মেলে দেখব লীলা।
মাখব গায়ে ব্রজের রজঃ,
আসবে কানে বেণুর সুর,
বহুজনমের সাধনা মোর
আজ ব্রজের ধূলায় হবে যে পুর।

(পরবর্তী অংশ)

গীতার মর্ম

শ্রীদেবপ্রসাদ রায়

এই যে ক্লৈব্য পরিহার করে জাগ্রত করা, সচেতন করা, তা আমরা স্বামী বিবেকানন্দ প্রমুখ নানা মহাপুরুষের বাণীতে বিশেষভাবে এযুগেও শুনেছি। তাঁরাও বারবার শুনিয়েছেন উপনিষদের সেই জাগরণের মহামন্ত্রটি, যেটি তাঁদের বিশেষ প্রিয় ছিল— "উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্যবরান্ নিবোধত"। সেখানেও সেই একই কথা। প্রথমেই বললেন না যে শ্রেষ্ঠ জ্ঞানীর কাছে গিয়ে জ্ঞান লাভ করো, 'নিবোধত'। শুধু একথা বলে দিলেই তো হত। কিন্তু যাব যে জ্ঞানীর কাছে, সজাগ হয়েতো যাব, তবে তো সেখান থেকে লাভ করে আনতে পারব কিছু। সজাগ হয়ে যাওয়াটা সর্বাগ্রে প্রয়োজন। তাই উপনিষদের ঋষি প্রথম বলেছেন, 'উত্তিষ্ঠত', ওঠো, 'জাগ্রত' জাগো, তারপর 'প্রাপ্য বরাণ্ নিবোধত'। 'নিবোধত' সবার শেষে আগে ওঠা এবং জাগা।

যখন সবাই সুপ্ত, সেই সময় তাদের বড় বড় তত্ত্বজ্ঞানের কথা শুনিয়ে কোন লাভ নেই। তাকে প্রথম জাগাতে চেষ্টা করতে হয়, উদ্বুদ্ধ করার চেষ্টা করতে হয়, তাতে প্রাণসঞ্চারের চেষ্টা করতে হয়, তাহলেই ক্রমশঃ ক্রমশঃ সে আত্মবান হতে পারবে। কেন না, আগে প্রাণসঞ্চার না হলে মৃতকল্প দেহের মধ্যে আত্মার উপলব্ধি হয় না। সেই প্রাণসঞ্চারের মন্ত্রই প্রথম ভগবান তাকে শোনালেন। "তুমি ওঠো। এই ক্লৈব্য, এই জড়তা, এর মধ্যেই যদি তুমি নিজেকে নিমগ্ন করে রাখো তাহলে কোনোকিছুই লাভ করতে পারবে না"। এইভাবে সর্বপ্রথম তিনি আমাদের জাগান।

লক্ষ্য করবার বিষয় সেসব দেশের অধ্যাত্ম শাস্ত্রে, একজাতীয় কথাই কী সুন্দরভাবে বলা হয়েছে। এজন্য অধ্যাত্মশাস্ত্রে বলা হয় যে যাঁরা অধ্যাত্মপথের পথিক তাঁদের কোনো দেশভেদ নেই, কালভেদ নেই, তাঁরা সবাই যেন একদেশের অধিবাসী, এক কালের অধিবাসী। আমাদের দেশে যেমন এই উদ্বোধনের বাণী, জাগরণের বাণী শোনা যায়, তেমনি পাশ্চাত্য দেশেও যারা মরমিয়া সাধক, সেই মরমিয়াদের, mystic দের বাণীতেও এই উদ্বোধন ও জাগরণের কথা শোনা যায়। তাঁরা বলেছেন, এই অধ্যাত্ম পথের প্রথম ধাপ হল awakening অর্থাৎ জাগরণ। যেমন, সাধারণ জীবনযাত্রা চলছিল, এসব কোনো ব্যাপারই জানা ছিলনা কোনোদিন, হঠাৎ এক ধাক্কায় যেন আমি জেগে উঠলাম। যখন জীবনে একটা ধাক্কা আসে সঙ্কট আসে, তখন আমরা এই সুখ-সুপ্তি থেকে জেগে উঠি, নইলে জাগবার কোনো প্রয়োজন হয় না। ঘর আছে, দুয়ার আছে, ধন ও দৌলত আছে, নিশ্চিন্ত সুখে বেশ নিদ্রা যাচ্ছি। কিন্তু যখন সেই সঙ্কট এল জীবনে, তখন আমরা হঠাৎ জেগে উঠি। যে কোনো কারণে মানুষ যখন জেগে ওঠে প্রথম, সেই জেগে ওঠার লগ্নই হল সূচনা অধ্যাত্ম জীবনের।

প্রত্যেক মরমিয়া সাধকের জীবন যদি আমরা পর্যালোচন করি এইভাবে তাহলে আমরা দেখতে পাব যে, হঠাৎ তাঁদের জীবনে একটা সঙ্কট ঘনিয়ে এসেছে। ওদের দেশের একজন মস্তবড় ধর্মযাজক লুথার।

লুথারের জীবনী কার্লাইল তাঁর Hero and Hero worship গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। সেখানেও দেখি জীবনের প্রথম দিকে লুথার একজন সাধারণ লোক ছিলেন, শিক্ষিত একজন যুবকমাত্র। তাঁর একটি অভিন্ন হৃদয় বন্ধু ছিল। দুই বন্ধুতে মিলে একদিন বেড়াতে বেরিয়েছেন, এমন সময় হঠাৎ আকাশে মেঘ ঘনিয়ে এলো। পরক্ষণেই তাঁর বন্ধুটি বজ্রাঘাতে নিহত হলেন। বন্ধুর প্রাণশূন্য দেহ তাঁর পাশেই লুটিয়ে পড়ল। অভিন্নহৃদয় বন্ধুকে চোখের সামনে এইভাবে পলকের মধ্যে জিজ্ঞাসা জেগে উঠল, 'Is this life'?

এই কি জীবন? এইমাত্র যে ছিল আমার পাশে, হেসে হেসে কত কথা বলছিল, সেই প্রাণের বন্ধুটি আমার একমুহূর্তের মধ্যে কোথায় চলে গেল? এই আকস্মিক বন্ধু বিচ্ছেদের তীব্র আঘাতে তাঁর সমস্ত জীবনের মোড় ঘুরে গেল। এই যে জীবনের মোড় ঘুরে যাওয়া একটি সঙ্কটের ফলে, এইটি হল জীবনের সবচেয়ে শুভ মুহূর্ত। সেই শুভ মুহূর্তের মানুষ জাগে, তার আগে সে শুধু ঘুমোয়।

আমরা পারিভাষিক কথায় শুনি, যেমন আগমশাস্ত্রে, তন্ত্রশাস্ত্রে বলা হয়েছে কুলকুণ্ডলিনীর জাগরণ। আমরা তা নিয়ে অদ্ভুত কল্পনা করি, দেহের মধ্যে কোথায় আছে কুলকুণ্ডলিনী, হয়তো সড়সড় করে মেরুদণ্ডের মধ্য দিয়ে উপর দিকে যায়, তাকে বলে কুলকুণ্ডলিনীর জাগরণ, হয়তো কোনো অদ্ভুত অনুভূতি হয় ইত্যাদি। কিন্তু আসল জাগরণ মনে হচ্ছে অন্য। ঐ কুলকুণ্ডলিনীর মানে হচ্ছে সুপ্ত বা ঘুমন্ত চৈতন্য শক্তি। চাই সেই চৈতন্যের জাগরণ। সাধারণ সব মানুষই আমরা মৃতকল্প, আমাদের মধ্যে যেন প্রাণ নেই, কারণ চৈতন্য সেখানে সুপ্ত। কিন্তু হঠাৎ এক ধাক্কায় মানুষ জেগে ওঠে, জীবনে কোনো সঙ্কট লগ্ন যখন আসে। সেই সঙ্কট লগ্নে যখন জেগে ওঠে মানুষ, তখন হঠাৎ তার জীবনের গতিবেগ ফিরে যায়, মোড় ঘুরে যায়।

(ক্রমশঃ)

দ্বন্দ্বাতীত

শ্রীমতী মেখলা দত্ত

সাদা কালোর রঙে ভরা
এই পৃথিবী রঙ্গে ভরা।
দ্বন্দ্ব যত কালোয় সাদায়
আবার রঙ ফোটেনা এরা ছাড়া
মন্দ ভালোর দ্বন্দ্ব নিয়ে
পৃথিবী আজ লক্ষ্মী ছাড়া।

কবে আমি রঙিন হবো
তোমার রঙে রঙ ছোপাবো?
সাদা কালোর দ্বন্দ্ব ছেড়ে
তোমার পায়ে মুখ লুকাবো?

তোমার পাদ পদ্ম মাঝে
আমিই শ্বেত পদ্ম হবো,
ভক্তি প্রীতির কাজল পরে
সবার হৃদে রঙ ছড়াবো।

স্মৃতির আলোকে বিগত দিন (৩য় খণ্ড)

শ্রদ্ধেয় সৌরেন্দ্রনাথ মিত্রের লেখা থেকে—

তখনকার ভক্তশিষ্যরা কেন জানি না, বেশ কিছু অংশ আশ্রমে আসাই বন্ধ করেছিলেন। এর পর ১৯৪১ সাল থেকে ১৯৪৪ সাল পর্যন্ত আমার পুরো পরিবার দেওঘরে বাস করেছিলেন আশ্রমের পাশে বিশুদ্ধ নিবাসে, যেটি আজকে শ্রীশ্রীবালেশ্বর ভবন নামে পরিচিত হয়েছে। সেইজন্য কিভাবে যে এই প্রায় ভক্ত-শিষ্যহীন আশ্রম পুনরায় ভক্ত-শিষ্যে পূর্ণ হতে আরম্ভ করেছিল, তা চাক্ষুষ দেখার সৌভাগ্য লাভ হয়েছিল আমার।

বড় মহারাজজীর শিষ্যদের মধ্যে যাঁদের আসা-যাওয়া তখনও ছিল আশ্রমে তাঁদের মধ্যে মনে পড়ে পটনার মিহিরবাবুকে (রায়)। মহারাজজী আশ্রমের ভার নেওয়ার পর দীক্ষাদান শুরু করেন ১৯৪২ সালে রামনবমীর দিন। এর পর থেকে ধীরে ধীরে আশ্রমে আনাগোনা শুরু হয় নূতন শিষ্যদের। ক্রমশঃ দেখা যায় যে শ্রীশ্রীবালানন্দজীর শিষ্যবর্গও, যাঁরা আশ্রম সম্বন্ধে উদাসীন হয়ে গিয়েছিলেন তাঁদেরও কিয়দংশ পুনরায় আশ্রমে যাতায়াত শুরু করেছিলেন। আজ যখন মহারাজজীর চরণে হাজার হাজার ভক্ত শিষ্যকে প্রণত হতে দেখি আশ্রমে কোনও অনুষ্ঠানে গিয়ে, যখন প্রচুর ভক্ত-শিষ্যের আগমন দেখি সেখানে, বার বার মন চলে যায় সেই সব দিনে, যেদিন মহারাজজী প্রথম দীক্ষা দেওয়া শুরু করেছিলেন ও ভক্তশিষ্যের সংখ্যা ছিল হাতে গোনা। এছাড়া ১৯৪৬ সাল থেকে ১৯৪৭ সালে পুনরায় আমরা বাস করেছিলাম দেওঘরে রাজনিবাস ভবনে এক বৎসরের উপর।

এরপর ধীরে ধীরে বাড়তে শুরু করেছিল সেই সংখ্যা। এমন কি শ্রীশ্রীবালানন্দজীর শিষ্যরা যাঁরা কেন জানি না এই আশ্রমের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিলেন, শুরু হয়েছিল তাঁদের আগমনও। এক কথায় সেই আশ্রম পুনরায় ভর্তি হতে শুরু করেছিল। কিন্তু আজ আমার মনে বিস্ময় জাগে যে সেদিনকার এই যে ভক্ত-শিষ্যের সংখ্যা ক্রমবর্দ্ধমান দেখেছিলাম সেদিন কি একবারও কেউ ভেবেছিল যে ভবিষ্যতে এই বর্দ্ধমানের পরিমাণ কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে? আজ মহারাজজীর চরণে এসেছেন হাজার হাজার শিষ্য-ভক্ত সারা পৃথিবী জুড়ে। জানি না আশ্রমে এই ভক্তশিষ্যদের সঠিক সংখ্যার হিসাব রাখা সম্ভব হয়েছে কিনা?

আমার বয়স তখন যতদূর মনে পড়ছে উনিশ-কুড়ি বৎসর। সে সময় যাঁরা আসতে শুরু করেছিলেন সকলেই ছিলেন প্রায় আমার বয়ঃজ্যেষ্ঠ। আমি কিন্তু সকলের অত্যন্ত স্নেহের পাত্ররূপে পরিগণিত হয়েছিলাম। এসেছিলেন পাটনার retired জজ সুবোধ চট্টোপাধ্যায় ও আরও অনেকে। কলকাতা থেকে, ভাগলপুর থেকে, নানা জায়গা থেকে ভক্ত-শিষ্যের আগমন হয়েছিল।

আজ জীবনের প্রান্তে এসে কিছুতেই সেই আগমনের সময়ের ভক্তশিষ্যের সকলের নাম মনে পড়ছে না। তবে যাঁদের নাম স্মৃতিতে আজও ধরা আছে, যাঁরা আজও অবসর সময়ে চিন্তার মাঝে এসে

চোখের সামনে দাঁড়ান তাঁদের মধ্যে কয়েকজন হলেন ডলিদি (মিত্র), তাঁর বোন স্নেহদি, স্মৃতিদি (চৌধুরী) ভানুদি, কমলা (বিশ্বাস) ও তাঁর মাতৃদেবী, মহিমামুকুল (হাজরা) মেসোমশাই ও তাঁর স্ত্রী নীরজা মাসীমা, তাঁদের কন্যা গীতা, বধূ ঝর্ণা, বেলেঘাটা চড়কডাঙার অমরবাবু (বসু), তাঁর স্ত্রী যোগমায়াদি, কন্যা দীপ্তি, পুত্রদ্বয় জয়ন্ত ও বুল্টু (রেবন্ত)। এসেছিলেন আরো কতজন। ধীরে ধীরে এসেছিলেন বিজনদা (চক্রবর্তী), ধর্মদা (দত্ত), পূর্ণদা (বারিক) ইত্যাদিরা। এই পূর্ণদার দান করা জমির উপর আজ গড়ে উঠেছে বেহালায় শ্রীশ্রীবালানন্দ ব্রহ্মচারী হাসপাতাল। কিভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল সেই হাসপাতাল সব লিখে রেখে যাওয়ার ইচ্ছা। বণ্ডেল রোডের রবীনদা (পাল) কি আমার মন থেকে কখনও মুছে যাবেন? তাঁর গৃহে মহারাজজীর অবস্থান সময়ে কত আনন্দ উপভোগ করেছি। তাঁর নিত্য কর্মস্থল মহাত্মা গান্ধী রোডে অবস্থিত দোকানে আমার কতদিন দুপুর কেটে গেছে তাঁর সঙ্গে মহারাজজীর প্রসঙ্গ আলোচনা করে।

মনের দরজায় এসে দাঁড়িয়েছেন এই মুহূর্তে ভাগলপুরের প্রভাতদা (সেন)। জীবনের শেষ ভাগে কলকাতায় বসবাস শুরু করেছিলেন। যাদবপুরে রেবাদের গৃহের সন্নিকটে ছিল তাঁর আবাসস্থান। তাঁর সরব চীৎকার করে গুরুদেবের জয়ধ্বনি দেওয়া আমার যেন কানে এসে ঘা দিচ্ছে তাঁর কথা চিন্তা মাত্র। তাঁর সেই জয়ধ্বনি দেওয়ার সময়ের মুখচ্ছবি যেন স্পষ্ট চোখের সামনে ফুটে উঠছে। গলা উত্তররোত্তর উচ্চগ্রামে যাচ্ছে। সমস্ত চোখ মুখেও তার ছায়া পড়ে যাচ্ছে। সেগুলি তাদের স্বাভাবিকত্ব হারিয়ে ফেলছে।

ভুলিনি আশাদির (পুরী) পিতৃগৃহে তাঁর পিতৃদেবকে বা তাঁর পরিবারের ব্যক্তিদের। আদুদা (শোভনেন্দু) বা বাদুদা (নির্মলেন্দু) আমার স্মৃতিপটে চিরকাল উজ্জ্বল হয়ে বেঁচে থাকবেন। আদুদার উপর মহারাজজীর কৃপার কথা কি করে ভুলব? কঠিন রোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন, সে সময় তাঁর কত সাংসারিক কর্তব্য বাকী ছিল। কিন্তু তাঁর আশীর্বাদ, তাঁর কৃপাধারা, তাঁর করুণা তাঁকে সংসারের সব কর্তব্য, সব দায়িত্ব সমাপন করিয়ে তবে বিদায় দিয়েছিল।

কেমন করে ভুলব টাটানগর জামসেদপুরের শৈলেনদাকে (চৌধুরী) ও তাঁর স্ত্রীকে। মহারাজজীর সঙ্গী হয়ে কতবার তার টাটানগরের গৃহে অবস্থানের সুযোগ হয়েছিল। মনে আছে একবার সস্ত্রীকও তার গৃহে অবস্থানের সুযোগ পেয়েছিলাম। দেওঘর আশ্রমে প্রতি বৎসর পূজায় ও যজ্ঞের সময় আশ্রমে নিয়মিত তাঁদের আগমন হোত। তিনি আশ্রমের ভিতর নর্মদার এক পাশে জমির উপর জীবদ্দশা পর্যন্ত বাসের জন্য যে গৃহ নির্মাণ করিয়েছিলেন সেই গৃহে তাঁদের অবস্থানের সময় প্রতিবার কত আনন্দ কত আলোচনা।

টাটানগরের অমরমামা (চট্টোপাধ্যায়) আমার কাছে অমর হয়ে বিদ্যমান রয়েছেন আমার স্মৃতির পাতায়। প্রথম জীবনে তাঁর বাসস্থান ছিল কলকাতায় আমার মাতুল গৃহের পার্শ্বে। আমার মামা সুধাংশুবাবুর (ঘোষ) তিনি বাল্যবন্ধু। পরে নিজ কর্ম উপলক্ষ্যে তাঁর টাটানগরে আগমন হয়েছিল এবং সেইখানেই Retire-এর পর পরিবারবর্গের স্থিতিলাভ। তাঁর কন্যা রেশমী ও পুত্র সুজিৎ আমার অত্যন্ত স্নেহের পাত্রী ও পাত্র। মহারাজজীর টাটানগরে অবস্থানের সময় রেশমী মহারাজজীকে নিয়মিতভাবে গান শোনাত ও সেখানকার কীর্তন আসর পরিচালনা করত।

মনে পড়ছে সেই প্রথম জীবনে আশ্রমে দেখেছিলাম পাটনার জজ সুবোধবাবুকে (চট্টোপাধ্যায়), মিহিরদাদুকে (রায়) ও আরও কত জনকে। মিহিরদাদু ছিলেন শ্রীশ্রীবালানন্দজীর শিষ্য। পরে পাটনার কত গুরুভাই ভগিনীদের সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলাম। রজতদার (তলাপাত্র) কথা কি মন থেকে কখনও

মুছে যাবে? তাঁর বাসগৃহে মহারাজজীর অবস্থানের সময় আমি উপস্থিত হবার সৌভাগ্য পেয়েছি। তাঁর যত্ন আপ্যায়ণ কোনদিন ভুলব না।

বহুদিনের অসাক্ষাতের ফলে কতজনের নাম ভুলে গেছি তবে তাঁদের মুখচ্ছবি মনের মুকুরে প্রতিফলিত হচ্ছে। যাঁদের মুখচ্ছবি মনের আয়নাতে ভেসে উঠছে অথচ নাম ভুলে গেছি বা যেসব ঘটনার স্মৃতি মনকে নাড়া দিচ্ছে, তাঁদের সকলকে বা সেই সব ঘটনার বিবরণ কি ঠিক ঠিক ভাবে স্থান পাবে আমার এই রচনার মাঝে? কি জানি? যাঁর অলক্ষ্য নির্দেশে আমার এই রচনা, তাঁর যা ইচ্ছা তাই হবে বলেই আমি বিশ্বাস করি।

কত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনা, যার সত্যই কোন দাম নেই, সেইরূপ তুচ্ছ ঘটনাও আজ মনে ভেসে উঠছে, মনকে নাড়া দিচ্ছে, মনকে আনন্দে আপ্লুত করছে। তখন আমরা প্রত্যেকে প্রত্যেকের কাছে ছিলাম আত্মার আত্মীয়। আজ এই শ্রীচরণে বহু লোকের সমাগম। কিন্তু সেদিনের তৃপ্তি, সেদিনের ভাব আজ কারো ব্যবহারে খুঁজে পাই না।

আমার এই স্মৃতিকথার পূর্ব খণ্ডগুলি প্রকাশিত হওয়ার পরে আমাদের কোন এক গুরুভগিনী আমার কাছে প্রশ্ন রেখেছিল; আপনি আপনার পুস্তকে বার বার পুরানো দিনের আনন্দের কথা উল্লেখ করেছেন। বলেছেন যে সে আনন্দ হারিয়ে গেছে চিরতরে। তবে আজ কি মহারাজজীর এই আসরে আনন্দ নেই? আজকাল মহারাজজীর সান্নিধ্যে এসে আমরা যে আনন্দ পাই, সেই আনন্দ পূর্বের আনন্দের চেয়ে তফাৎ কিসে?

সে সময় তাকে কোন উত্তর দিই নি কারণ এ প্রশ্নের উত্তর নিরর্থক। তবু আজ লিখতে লিখতে মনে হোল যে হয়তো আরও কারো কারো মনে এই জিজ্ঞাসা থাকতে পারে। সেইজন্য আমার নিজের বিবেচনায় যা মনে হয়েছে তাই উত্তরে লিখে গেলাম।

এই যে মহারাজজীকে ঘিরে আনন্দ এটা একেবারে নিজস্ব অনুভবের জিনিস। এ আনন্দের কথা লোককে বোঝানো যায় না বা পেতে সাহায্যও করা যায় না। মহারাজজী সদানন্দময় পুরুষ। তাঁকে কেন্দ্র করে সর্বদাই আনন্দের স্রোত বয়ে চলেছে। এই আনন্দ সেদিনও ছিল আজও নিশ্চয়ই আছে। তবে তার পরিমাপের অনেক অনেক তফাৎ।

চিনি ও রসগোল্লা। চিনিও মিষ্টি, রসগোল্লাও মিষ্টি। কিন্তু আমাদের রসনাকে বেশী তৃপ্তি দেয় রসগোল্লা, এতে নিশ্চয়ই কারো সন্দেহ নেই। কিন্তু-এর কারণটা কি? রসগোল্লাতেও চিনি বর্তমান কিন্তু সঙ্গে মিশ্রিত হয় ছানা। সেটা মিশ্রিত হয় বলে চিনির যে মিষ্টতা, তার চেয়ে বেশী উপাদেয় হয় রসগোল্লা। মহারাজজীকে ঘিরে বা তাঁর সান্নিধ্যে যে আনন্দ সে তো চিনির চিরস্থায়ী মিষ্টতার মতো চিরস্থায়ী। সে আনন্দ সে সময়েও যেমন ছিল আজও সেইরূপই আছে। এ বিষয়ে কোন সংশয় নেই। তবে পূর্বেকার আনন্দকে অতুলনীয় বলার কারণ? রসগোল্লার মতন সেই আনন্দের সঙ্গে যুক্ত থাকত অন্য এক আনন্দ যেমন রসগোল্লা তৈয়ারী হয় চিনির সঙ্গে অন্য এক বস্তু ছানার সংমিশ্রণে।

(ক্রমশঃ)

কাশীতে কয়েকটা দিন

শ্রী সোমনাথ সরকার

শ্রী শ্রী গুরুমহারাজকে প্রণাম জানাই। বাবা বিশ্বনাথ আর মা অন্নপূর্ণাকে প্রণাম জানাই। বিঘ্নবিনাশন গণেশকে প্রণাম জানিয়ে আমার লেখা শুরু করছি।

Cabin থেকে Pilot এর announcement টা ভেসে আসতেই সচকিত হয়ে উঠলাম। "Good afternoon Ladies and Gentlemen shortly we are going to Land on Shri Lal Bahadur Shastri Airport, Varanasi, Outside temp is 38°C. Please Fasten your seatbelts and observe no Smoking Sign, Thank you," Airport থেকে গাড়ীতে গোধুলিয়ার দিকে যেতে যেতে দেখছিলাম, এর আগে যতবার কাশী বা বারাণসীতে এসেছি, এবারে দেখছি তার চেয়ে রাস্তাঘাট অনেক উন্নত হয়েছে। প্রায় ৪ কিলোমিটার লম্বা Four lane চওড়া রাস্তা। গাড়ীগুলো দ্রুতগতিতে শহরের দিকে চলেছে। প্রায় একঘণ্টা বাদে পৌঁছলাম গীর্জাঘরের কাছে। গাড়ী আর এগোবে না। বাকী পথটুকু হেঁটে যেতে হবে। শোনা যায় এটিই এ অঞ্চলের খ্রীষ্টানদের করা সবচেয়ে প্রাচীন গীর্জা।

Hotel এর লোক Luggage গুলো নিয়ে চলল। সঙ্গে আমরা হেঁটে চললাম। বাইরের 38°C Temperature বেশ মালুম হচ্ছে। প্রায় ২০০ মিটার হাঁটবার পর Hotel. এবারে আমাদের পাঁচ দিনের কাশী বাসের অবস্থানের ঠিকানা দশাশ্বমেধ ঘাট রোডের হোটেল লারা ইন্ডিয়া।

আজ ২৬ শে মার্চ, ২০২৩, রবিবার। হোটেলে যখন পৌঁছলাম তখন ঘড়িতে দুপুর সাড়ে তিনটে বাজে।

হোটেলের ঘরে অল্প একটু জিরিয়ে, জামাকাপড় পরে বেরিয়ে পড়লাম। গোধুলিয়ার মোড়ে এসে রিক্সা নিলাম। আমাদের গন্তব্য কালভৈরব মন্দির। শ্রী কালভৈরব কে বলা হয় কাশীর কোতোয়াল। তাঁর অনুমতি নিয়ে তবেই কাশী দর্শন ও বাবা বিশ্বনাথের পুজো দিতে হয়।

এর আগে যতবার এসেছি, রিক্সা কালভৈরব মন্দির পর্যন্ত যেত। এবারে কিন্তু তা গেল না। রিক্সা প্রধান রাস্তার ওপর রিক্সা stand এ নামিয়ে দিল। কালভৈরব মন্দিরের গলির মুখে পুলিশের ব্যারিকেড। বাকী পথটুকু হেঁটে মন্দিরের কাছে পৌঁছলাম। আজ রবিবার। কালভৈরবের বার। কাতারে কাতারে লোক। লম্বা লাইন এঁকে বেঁকে বহুদূর চলে গেছে। ভীড়ের চাপে কালভৈরব মন্দিরের কাছের কালো কুকুরগুলো কোথায় যে পালিয়ে গেছে, দেখতে পেলাম না।

একটা ডালার দোকানে জুতো রেখে পুজোর জন্য ডালা নিলাম। ফুল, মালা, কালো ডোর, সরষের তেল আর প্রসাদ এর প্যাকেট। দোকানদার একজন পাণ্ডার সঙ্গে যোগাযোগ করিয়ে দিল। সে ভীড় এড়িয়ে পিছনের গেট দিয়ে মন্দিরের ভিতরে নিয়ে গেল।

বাবা কালভৈরব কুকুরের পিঠে এক পায়ের ওপর অন্য পা দিয়ে বসে আছেন। তাঁর গায়ের রং ঘন

নীল। গলায় সর্পযজ্ঞ উপবীত। কপালে চন্দ্রকলা। তিনটে নয়ন। রূপার মুখ। মাথার মুকুটে বিরাট সবুজ পাথর। মনে হয় পান্না। মাথার জটায় রুদ্রাক্ষের মালা জড়ানো। গলায় রূপার কপাল মালা। এছাড়াও বহু রত্নের ও ফুলের মালা গলায় পরানো। চতুর্ভুজ। হাতে ত্রিশূল, টঙ্ক নামের অস্ত্র, পাশ ও দণ্ড। ইনি মৃত্যু দর্পনাশক। দৃষ্টিপাতেই জীবের সমস্ত পাপ নাশ করেন।

পুরোহিত হাত থেকে ডালাটা নিয়ে সরষের তেলটা রেখে দিলেন। মালা পরিয়ে দিলেন। প্রসাদ ও ডোর স্পর্শ করিয়ে ফেরত দিলেন। কথিত আছে এই কালো ডোর পরলে সমস্ত বিঘ্ন নাশ হয় ও অসুখ বিসুখ ভাল হয়ে যায়। আমরা আবার প্রণাম করে মন্দির বিগ্রহ প্রদক্ষিণ করলাম। কালভৈরবের মূর্তির পিছনে প্রদক্ষিণ এর পথে একটা কালো পাথরের বেদী আছে। তাতে নবগ্রহ মূর্তি আছে। আমরা সেই বেদী প্রদক্ষিণ করে নবগ্রহ কে প্রণাম করে বেরিয়ে এলাম।

কালভৈরব মন্দির থেকে বেরিয়ে ডালার দোকান থেকে চটি সংগ্রহ করে বড় রাস্তায় এসে একটা রিক্সা নিয়ে গেলাম "Sree Kashi Viswanath Temple Trust" এর office এ।

এই ব্যবস্থাপনা মন্দিরের নতুন চত্বর (প্রাঙ্গণ) তৈরী হবার পর। office থেকে জনপ্রতি ৩০০ টাকা হিসাবে ৬০০ টাকা নিয়ে দুটো টিকিট কাটলাম আমার আর আমার স্ত্রীর জন্য। office থেকে একজন পাণ্ডা সঙ্গে দিয়ে দেওয়া হল। পাণ্ডাজি আমাদের সঙ্গে নিয়ে যখন মন্দিরের চার নম্বর VIP গেট এর দিকে হাঁটছে তখনই চোখে পড়ল আকাশ ঘন কালো করে একটা মেঘ দক্ষিণ দিক থেকে উঠছে। হঠাৎ একটা দমকা ঝোড়ো হাওয়ার সঙ্গে ধুলোয় চারিদিক ঢেকে গেল। আমরা চোখে রুমাল চাপা দিয়ে চার নম্বর VIP গেট দিয়ে মন্দির চত্বরে প্রবেশ করলাম। টিপ্ টিপ্ বৃষ্টি পড়তে শুরু করেছে। পাণ্ডাজী পুজোর ডালা আর দুধ গঙ্গাজল সংগ্রহ করে নিয়ে এল। আমরা চার নম্বর গেট দিয়ে ঢুকলেও অন্যান্য গেট অর্থাৎ দশাশ্বমেধ ঘাট রোডের এক নম্বর গেট, বাঁশফটকের দু নম্বর গেট এবং মণিকর্ণিকার দিকের কাশী করিডোরের তিন নম্বর গেট সব দিকের তীর্থযাত্রী একসঙ্গে মূল মন্দিরের গর্ভগৃহের সামনে জড়ো হয়েছে। ফলে সেখানটায় বেশ ভীড়। ইতিমধ্যে বেশ বড় বড় ফোঁটায় বৃষ্টি শুরু হয়ে গেছে। আমরা লাইনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভিজছি। মাথার ওপর খোলা আকাশ। পাণ্ডাজী আমাদের সংকল্প করিয়ে দিলেন। আমরা লাইনে দাঁড়িয়ে এগোতে এগোতে গর্ভগৃহের দরজার কাছে পৌঁছে বাবা বিশ্বনাথের মাথায় দুধ গঙ্গাজল বেলপাতা ঢাললাম একটা চোঙা দিয়ে। তখন গর্ভগৃহে ঢোকার সময় নয়। বাবা বিশ্বনাথের ঘন কালো লিঙ্গ সোনার গৌরীপট্টে প্রথিত। চারপাশ রূপো দিয়ে বাঁধানো। মাথার ওপর চেন এ ঝুলছে বড় একটা রুপোর ঘড়া। গর্ভগৃহের চারটে দ্বার রুপোর পাত দিয়ে বাঁধানো। চারটে দ্বারের চারটে চোঙার মাধ্যমে অগণিত ভক্ত যারা চারটে গেট দিয়ে প্রবেশ করেছে, বাবার মাথায় ঢেলে চলেছে বেলপাতা দুধ গঙ্গাজল।

দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গের অন্যতম এই কাশীর বাবা বিশ্বনাথ। আর সপ্তমোক্ষদায়িকা পুরীর অন্যতম এই কাশী।

কাশী বিশ্বনাথের মন্দির বেশ কয়েকবার বিধর্মীদের দ্বারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। ১৪৯৪ সালে সিকান্দার লোদি কাশীর বিশ্বনাথের মন্দির ও অন্যান্য বহু মন্দির ধ্বংস করে বহু ধনরত্ন সোনাদানা লুণ্ঠন করে দিল্লী ফিরে যান।

পরবর্তী অংশ ৫৪ পৃষ্ঠায়

Amrapali–an epitome of life

–Dilip Kumar Dutta

Human beings come on to the surface of this earth with pristine glory and hallowedness. In course of time, his or her purity begins to get cloyed under the influence of the three factors, namely, instinct, heredity and environment. It is true that a child in infancy sometimes betrays outstanding talent or proclavity towards a particular aspect of life. However, this is possible due to the instinctive attainments of the child. During this phase of life, neither the environment nor the hereditary factors exercise a telling influence.

As a child grows up and his memories swell in the repertoire of his mind, he gradually becomes divorced from his early glory. In fact, child- hood is the time when, we feel throughout the rest of our lives, the heavenly bliss and joy is experienced. In our later lives, we may rise to the pinnacle of material prosperity and fame but we never experience the beatitude which constantly encircles a child. This purest state of existence keeps him or her inalienably linked with the whole universe. That is why, a child irrespective of time, place and parentage, is unfailingly happy. On the contrary, a grown-up person, laden with memories, considers himself to be segregated and hence, he loses his blessedness, his joy-however rich and famous he may be. But this loss of purity and joy is not eternal nor irremediable. Knowingly or unknowingly, he struggles to hark back to his days of glory, in other words, to the state of happiness enjoyed in his infancy. This quest of happiness gets crowned only when he or she comes in contact with a noble soul who himself is a fountain of joy and appears in the garb of a Guru. To my wind, all spiritual leaders basically and ultimately try to bring suffering humanity back to their original or childhood purity. Nostalgia, in other words signifies a man's eternal hunger to get back the blessed olden state of life.

When we analyse the lives of great men and women in any walk of life, we notice that all of them invariably suffer from a deep sense of dissatisfaction and despair. Examples can be given from the domain of science, literature, philosophy etc. Many of them, however apparently successful on the material plane, attain a state of blessedness and joy when they again visualize their own identity. It will not be out of place to present hereunder the memorable resurgence of Amrapali under the engrossing influence of Lord Buddha.

Like many girls, Amrapali was born in humble circumstances and spent her childhood days in the company of her play-mates amidst joy. She was very dear to her companions

who could hardly think of estrange- ment from their beloved friend. In course of time, she grew up to be a very beautiful young lady. One day while she was in the company of her friends, she drew the attention of Pushpagandha who was an outstanding dancer. Amrapali came under her tutelage and in a very short span of time became a noted dancer. An outstanding performer blessed with her bewitching beauty, Amrapali was easily elected the court-dancer of Baishali.

A new facet of life started for Amrapali. She was a lady with a pure soul having rosy dreams in life. She was born under a mango tree and hence was named 'Amrapali'. Before her unmatched beauty reeled many crowns and heroes, There were inmemerable suitors arrayed before her. They were ready to sacrifice all that they possessed on earth. But was this the life she dreamt of? Her pure heart always looked forward to the one who could realise her and rescue her from the infernal condition even in the midst of inexhaustible luxury and riches. Ajatasatru, the famous king of Magadha, tried various means to win the heart of Amrapali but she refused him_brusquely.

Amrapali could realise that the youth, the lush beauty of the fields and blooming flowers, the winsom flashes of lightning and the seven colours of rainbow are but ephemeral. She always hankered after a joy that would be perennial and untiring. She was really lost in the slough of despondency and no earthly enticements gave her satisfaction and joy.

At this juncture of her life, she suddenly got the call from Lord Buddha whose clarion-call to pursue the eight-fold path of 'Nirvana' appealed her immensely. She at once left her luxury and joined the camp of Lord Buddha. In fact, under the bracing influence of Lord Buddha, she again got back her childhood glory and purity. She has become a living example of what life should be to all humanity.

(পুনঃমুদ্রিত)

পূর্ণ শরণাগতি হলো তাঁর বিরাট সত্তার মাঝে আমাদের ক্ষুদ্র সত্তাকে চিরতরে সঁপে দিয়ে এই আমিত্ব বোধের কারাগার হতে মুক্ত হওয়া। তাই যদি ভগবানের কাছে কিছু চাইতেই হয় তবে তাঁর কাছে চেতনার এই বিশ্ব ব্যাপ্তি চাও। হে ভগবান! দাও মোরে নব নব প্রাণ।

—শ্রীশ্রীগুরুমহারাজজী

শ্রীশ্রী গুরুমহারাজজীর শ্রীচরণাশ্রিত শ্রী শঙ্কর ভৌমিক ও শ্রীমতী রুণা ভৌমিকের সৌজন্যে

পুণ্য-পরশ-পুলক (১৪শ পর্ব)

শ্রীবসুমিত্র মজুমদার

দেওঘর আশ্রমে কয়েকবারই গিয়েছি। সেখানেই আমাদের দুই ভাইয়ের পৈতে দিয়েছিলেন গুরুমহারাজ। সেই হিসেবে আমাদের গুরু এবং আচার্য স্বয়ং গুরুমহারাজ। পৈতের দিন ছিল বুধবার। আমাদের দুই ভাইয়েরই সেটা জন্মবার বলে বাবা সংশয়াপন্ন হয়ে চিঠি লিখেছিলেন গুরুমহারাজকে। উত্তরে জেনেছিলেন, যে কোনো মানুষের পক্ষে সবচেয়ে শুভ বার হল তার জন্ম বার।

যে সময়ে আমাদের পৈতে হয়েছিল, সেই সময় দেওঘর আশ্রমের কাছে থাকার জন্যে তেমন কোনো রিসর্ট, হোটেল, লজ ছিল না। লোকেদের বাড়ির একটা দুটো ঘর ভাড়া পাওয়া যেত। আশ্রম থেকে কিছুটা দূরে আমরা বাসা নিয়েছিলাম।

সকাল থেকে আশ্রমের যজ্ঞমণ্ডপের পাশে নান্দীমুখাদি কাজ কর্ম হল। তারপর গুরুমহারাজ এলেন পৈতে দিতে। পৈতের পর ভিক্ষা দিলেন; ফল, মিষ্টি, উত্তরীয় বস্ত্র, একটি সোনার আংটি, এক টাকার কয়েন আর একটা পৈতে। আমাদের পুরোহিত বলতে শিখিয়ে দিলেন,

'ভগবন্ ভিক্ষাং দেহি'। তারপর ভিক্ষা নিয়ে বলতে বললেন, স্বস্তি।' মায়েদের থেকে ভিক্ষা প্রার্থনার সময় বলালেন, 'ভগবতী ভিক্ষাং দেহি'।

পৈতের পর সেদিনই দণ্ডী ভাসানোর অনুমতি দিলেন গুরুমহারাজ। আশ্রমের নর্মদা কুণ্ডে দণ্ডী ভাসানো হল।

সেটা হয়েছিল যজ্ঞের সময়। তখন পনেরো দিন ধরে যজ্ঞ চলতো। গুরুমহারাজ আগুনের সামনে বসে যজ্ঞ করতেন।

যজ্ঞকুণ্ডটা নিতান্ত ছোট ছিল না। আমাদের চোখের মাপে ছিল প্রায় সাত ফুট লম্বা, সাত ফুট চওড়া আর গভীরতাও ছিল সাত ফুট কি তার বেশি। সেই যজ্ঞের সমিধ ছিল বড় বড় কাঠের গুঁড়ি। ভক্তপ্রবর সারদা-দা সেই গুঁড়ি ঘাড়ে করে বয়ে আনতেন।

ওই সময় আমাদের মধ্যে তো গাম্ভীর্য তৈরিই হয় নি। আমরা কখনো তারা-দির পিছনে, কখনো সন্ন্যাসিনী আশাপুরী-দির পিছনে লাগতাম। মা, মাসী বলে দিয়েছিলেন 'তারা মা', 'আশা মা' বলতে, কিন্তু আমরা

বলতাম না। আমরা নিজেদের মতো আড়ালে বলার জন্যে তাঁদের নামকরণ করেছিলাম। তার কারণ ছিল এই যে, আশ্রমে আমাদের ছুটোছুটি হুড়োহুড়ি হৈ হৈ করে খেলা তাঁরা পছন্দ করতেন না। আর পুজো দেখার জন্যে তাঁরা সব সময় সামনের সারিতে বসে থাকতেন, আমাদের জায়গা ছাড়তেন না।

একদিন দেখলাম, সারদা দা, ঘাড়ে সমিধ নিয়ে মণ্ডপে ঢুকছেন। হঠাৎ কী খেয়াল হল বলে উঠলাম, 'শ্রীশ্রী গুরুমহারাজজী কী জয়'। বলার সঙ্গে সঙ্গে সারদা দা চমকে উঠে পিছন ফিরে একবার দেখলেন, তারপর আমাদের খুব করে বকলেন। বিশাল যজ্ঞে জোগাড় করার যে দায়িত্ব ছিল তাঁর ওপর। আমাদের ধ্বনি শুনে তিনি ভেবেছিলেন গুরুমহারাজ বোধ হয় এসে গেছেন, অথচ গোছানো তাঁর সম্পূর্ণ হয় নি। তাই চমকে গিয়ে

যখন তাকিয়ে দেখলেন, আমরা এমনিই জয়ধ্বনি দিচ্ছি, তখন তিনি স্বাভাবিক ভাবেই রেগে গিয়েছিলেন। কিন্তু সেদিন থেকে ওটাই হয়েছিল আমাদের মজার খেলা। যখন তখন সারদা দাকে দেখলেই গুরুদেবের জয়ধ্বনি দিতাম।

গুরুমহারাজ স্থণ্ডিলের সামনে বেদীতে বসে যজ্ঞ করছেন। পরনে ভারী বেনারসী। মাথার মুকুট থেকে পায়ের নূপুর পর্যন্ত শরীরে অলংকার ধারণ করেছেন। স্রুক (আহুতি দেবার হাতা) থেকে ঘি যজ্ঞকুণ্ডের পাড়ে পড়ার জন্যে অগ্নির লেলিহান শিখা মাঝে মাঝে সেখানেও জিহ্বা বিস্তার করছে। স্থণ্ডিলের বেদীর তিন পাশ ঘিরে তিন সারিতে ঋত্বিক ব্রাহ্মণরা তিল, ধুনো, গুগ্গুল, চিনি, ঘি ইত্যাদি সামগ্রী অগ্নিতে আহুতি দিচ্ছেন। সে এক এলাহি ব্যাপার ।

পনেরো দিন পরে যজ্ঞে পূর্ণাহুতি যেদিন দেওয়া হবে, সেদিন আশ্রমে উপস্থিত সমস্ত ইচ্ছুক ব্রাহ্মণরা পূর্ণাহুতি দিতে পারে। গুরুমহারাজের কাছ থেকে মণ্ডপের রেলিং পেরিয়ে ভক্তদের বসার জায়গা পর্যন্ত বাঁশের একটা চোঙা বা নল তৈরি করা হয়েছে। সেই নলের মুখে একজন একজন করে গায়ত্রী মন্ত্র উচ্চারণ পূর্বক ঘি ঢালবেন। অন্যপ্রান্ত গুরুমহারাজ নিজে ধরে আছেন। সেখান থেকে তা চলে যাচ্ছে যজ্ঞকুণ্ডের মধ্যে।

আমাদের পৈতে হয়েছে বলে আমরাও পূর্ণাহুতির দানের অধিকার পেয়েছি। বিপুল উৎসাহে আমরাও প্রস্তুত হয়েছি। এর পর যথা সময় একে একে সবাই আহুতি দিচ্ছেন। আমার সময় এলে আমিও নলের সামনে দাঁড়ালাম। কিন্তু এত তাপ যে ঘিয়ের পাত্র নিয়ে গায়ত্রী মন্ত্রটুকু যে বলবো, সেই ক্ষণটুকুও যেন দাঁড়াতে পারছি না। খালি ভাবছি গায়ত্রী মন্ত্রটা শেষ হলে বাঁচি। কোন ক্রমে ঘি ঢেলে বাইরে এসে দাঁড়ালাম। আঃ কী আরাম! বাবা বললেন, 'তা হলেই বোঝ, গুরুমহারাজ আগুনের অত কাছে, অত গয়না পরে, ওই রকম ভারি কাপড় পরে দিনের পর দিন ঘণ্টার পর ঘণ্টা কী করে বসে আছেন।"

বাস্তবিক, সে আগুনের শিখা মণ্ডপের ছাদ ভেদ করে উঠতো। আর গুরুমহারাজ নির্বিকারে তারই সামনে হয়তো ফুট দুয়েক দূরে ঘণ্টার পর ঘণ্টা এক আসনে বসে যজ্ঞ করতেন। মাঝে কোনো উঠা উঠিও করতেন না। এই যজ্ঞের আরো একটি বিষয় আমাকে সে সময় বিস্মিত করেছিল। তা হল যজ্ঞাগ্নি কোনো দেশলাই দিয়ে জ্বালানো হতো না। জ্বালানো হতো প্রাকৃতিক বৈদিক উপায়ে।

শ্রীশ্রীশারদীয়া দুর্গা পূজায় দেখেছি গুরুমহারাজের আর এক রূপ। নবপত্রিকার শ্রেয় ও প্রেয়রূপ—

জোড়া বেল তিনি নিজেই মই বেয়ে মণ্ডপের ছাদে উঠে গিয়ে গাছ থেকে পারতেন। আর প্রাণ প্রতিষ্ঠার পরেই মায়ের মূর্তি যেন বিশেষ উজ্জ্বল হয়ে উঠতো। আর বিসর্জনের পর দেখতাম সেই প্রতিমার সত্যি সত্যিই ম্লান মুখ । এখনো বুঝি না, সে আমাদের ছেলেবেলার দৃষ্টিবিভ্রম, না, সত্য দর্শন। সপ্তমী থেকে নবমী পর্যন্ত সপ্তমীতে সাতটি, অষ্টমীতে আটটি, নবমীতে নয়টি কুমারী পূজা পেতেন। আর দশমীতে দশটি কুমারীর সঙ্গে দশটি কুমারের পূজা হতো।

আর যখন তিনি আরতি করতেন, তখনই রবীন্দ্রনাথের গানের ওই কলিটির অর্থ অনুমান করতে পারতাম; 'সকল বাক্যে সকল কর্মে প্রকাশিবে তব আরাধনা'। আর প্রতিদিন পূজার শেষে ব্রহ্মচারীদের নিয়ে মণ্ডপ প্রদক্ষিণ করতেন শিখরিণী ছন্দে 'দেব্যাপরাধ ক্ষমা' স্তোত্র গাইতে গাইতে। ছন্দ গাওয়া আর বৈদিক স্বরের গান যে কী; সেই অভিজ্ঞতা এখানেই লাভ হয়েছিল।

পুজো শেষে গুরুমহারাজ আশ্রম থেকে অন্যত্র চলে গেলে; 'শূন্য ভেল মন্দির শূন্য ভেল সগরি', আমাদের খেলাতেও আর প্রাণ থাকতো না। *(ক্রমশঃ)*

কথা সৎসঙ্গ

শ্রীমতী অনসূয়া ভৌমিক

বড় মহারাজজীর 'সতাং প্রসঙ্গ' উল্টে পাল্টে দেখতে দেখতে প্রথমেই একটি সৎসঙ্গের বর্ণনা পেলাম; ভাবলাম এবার এইটা নিয়েই লিখি।

একদিন পরই সল্টলেকে শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ীর আশ্রমে যাওয়ার কথা। সেখানে ঢুকে দেখি বাঁদিকের দেওয়ালে জ্বল জ্বল করছে লেখা— "যদি না পাও সৎসঙ্গ, তবে থেকো নিঃসঙ্গ"। এখানেওতো সেই সৎসঙ্গেরই নির্দেশ দেওয়া আছে। সৎসঙ্গ না করতে পারলে বরং একাকী থাক তবে দুর্জন সমাগম কখনো নয়, এই প্রসঙ্গে বড় মহারাজজী কি বলেছেন দেখি। উনি বলছেন মিশ্রীর সরবৎ অন্ধকারে পান করলে ও মিষ্টি, আলোতে পান করলেও তাই। এভাবেই সৎসঙ্গ করলে ও বোঝো না বোঝো এক মিষ্টত্বের অনুভব হবেই। 'সৎসঙ্গে স্বর্গবাস, অসৎ সঙ্গে সর্বনাশঃ', তাই সৎসঙ্গের কোন তুলনা নেই। এই সঙ্গের এমনই প্রভাব যে এতে লোক যেমন ওপরে উঠতে পারে ঠিক তেমনই অসৎসঙ্গের ফলে নীচেও গড়াগড়ি খেতে পারে। এজন্য সর্বদাই সৎসঙ্গ করা উচিত। এই বলে উদাহরণ স্বরূপ তিনি একটি গল্প শুরু করলেন।

'কোন এক গুবরে পোকা একটি ভ্রমরকে বলল, ভাই তোমার ও আমার দুজনেরই পায়ের রং এক , কালো। এসো আমরা দুজন বন্ধু হয়ে যাই। ভ্রমর খুব আদরের সঙ্গেই গুবরে পোকাকে বলল, 'ভাই তুমি কেন এই গোবরের মধ্যে থাক, এখান থেকে বড় দুর্গন্ধ বেরোয়, চলো তুমি আমার সঙ্গে ওড়ো।' বন্ধুর কথা শুনে গুবরে পোকা ভ্রমরের সঙ্গে উড়তে শুরু করলো। ভ্রমরতো বন্ধুকে নিয়ে একটি পদ্মের উপর বসেছে, ফুলের সুগন্ধে গুবরে পোকা এমন মোহিত হয়ে গেল যে তার আর ওড়ার ইচ্ছে থাকল না। পদ্মের পাপড়ির আরও ভেতরে ও ঢুকে গেল। ভ্রমর কিছুক্ষণ পদ্মের উপর বসে থেকে বন্ধুকে না দেখতে পেয়ে উড়ে চলে গেল। আস্তে আস্তে দিন শেষ হয়ে এসেছে, পদ্মও তার পাপড়ি মুড়ে ফেলল আর গুবরে পোকা তার ভেতরে বন্ধ হয়ে রইল। পরদিন সকালে ঐ সরোবরে কোন ব্রাহ্মণ স্নান করতে এসে ঐ পদ্মটি দেখে ভাবলেন, 'বাঃ কি সুন্দর পদ্ম ফুটে আছে, এটি নিয়ে মহাদেবের কাছে যাই।' ব্রাহ্মণ পদ্মটি নিয়ে এসে মহাদেবের মাথায় চড়িয়ে দিলেন; গুবরে পোকাও ফুলের সঙ্গে মহাদেবের মাথায় বসে থাকল। পরদিন যত নির্মাল্য সবই গঙ্গায় ফেলা হল; সেখানে পদ্মের মধ্যে গুবরে পোকাও ছিল। সবই গঙ্গায় ভেসে যাচ্ছে। এর মধ্যে ভ্রমর তার বন্ধুকে খুঁজতে খুঁজতে এখানে এসে দেখলো, 'আরে গুবরে পোকাতো গঙ্গায় ভেসে যাচ্ছে,' দেখেই সে ডাকলো, 'বন্ধু কোথায় যাচ্ছো, ভেসে যাবে তো! শিগ্গির ওড়ো নাহলে মৃত্যু-নিশ্চিত'! এই শুনে গুবরে পোকা বলল, 'ভাই, এখন আমাকে মরতে দাও,' এবং এক দোঁহা শোনাল—

"সঙ্গৎ গুণ অনেক ফল, শিব মহেশকো বৈঠ, হে মিত্র মোয় যায়ে দে গঙ্গাজীকো পেট।"

সৎসঙ্গের ফল কত ভাল, যাতে আমি শিবের মাথায় চড়তে পেরেছি, হে বন্ধু এখন আমাকে গঙ্গাজীর বুকে ভেসে যেতে দাও; দ্যাখো বন্ধু সঙ্গের প্রভাব কেমন। আমি তোমার সঙ্গে একটুক্ষণ সঙ্গ করেই দেবাদিদেবের মাথায় চড়ার সুযোগ পেলাম, এখন নির্ম্মাল্যের সঙ্গে সঙ্গে আমারও গঙ্গাপ্রাপ্তি হচ্ছে, আমাকে আর বাঁচিওনা।"

কোথায় গুবরে পোকা গোবরে পরে থাকতো, ভ্রমরের সঙ্গে একটু থেকেই ওর কত উন্নতি হল! এজন্য পণ্ডিতব্যক্তিরা বলেছেন,

"ত্যজ দুর্জন সংসর্গম্।
ভজ সাধু সমাগমম্।"

ভক্তেরা বড় মহারাজজীকে বললেন, আপনার মধুর উপদেশ শুনে যেই আপনার কাছে আসে সেই-ই মুগ্ধ হয়ে যায়। তখন উনি সন্ত তুলসীদাসের এক দোঁহা আওড়ালেন।

'তুলসী মিঠে বচনকো সুখ উবজে ঘনঘোর।
বশীকরণ এক মন্ত্র হ্যায় ত্যাজ দে বাক্য কঠোর।।'

হে তুলসী তুমি মিষ্টি মিষ্টি কথা বল, মিষ্টি কথা শুনলে মানুষের মনে সুখ হয়, বশীকরণ কোন মন্ত্র নয়, কঠোর বাক্য ত্যাগ করতে পারলেই বশীকরণ মন্ত্র লাভ হয়। মিষ্টি কথাতেই লোকের মন অতি সহজেই জয় করা যায়; আর ঐ কথা লোকে মান্য করেও চলে। বুলি এক অমূল্য ধন, তা যে বলতে পারে, সে পারে, ঠিকমত বুলি বলতে পারলে তাতেই অনেক কাজ হয়। বড় মহারাজ এবার ভক্তদের বললেন, 'আমি তোমাদের কি দিয়েছি? কিছুইতো দিইনি, এক বুলিইতো বলেছি, কিন্তু তাতেই তোমরা মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে বসে আছ। শব্দই ব্রহ্ম, তবে শব্দ প্রয়োগ করার বিধি জানা চাই। যেমন দেখো একজন লোকের ফাঁসীর আদেশ হয়েছে, সে যদি কোন ভাল ব্যারিস্টার লাগাতে পারে, তবে লোকটির ফাঁসী রদ করে দিতে পারে, ওর প্রাণও বেঁচে যায়। গুরুও শিষ্যকে কি দেন? কিছুই না— কেবল এমন একটি বুলি বলে দেন যার সাহায্যে শিষ্যের ঈশ্বর লাভের পথ প্রশস্ত হয়ে যায়। তবে কিভাবে কথা বলতে হবে, সেটাও জানতে হবে। সকলে এর সন্ধান জানেনা। যেমন কোন মোকদ্দমা চলাকালীন ভালো ব্যারিস্টার লাগাতে পারলে যে মোকদ্দমা হার হবার কথা তাও জেতা যায়। ঠিক একই ভাবে আমাদের ঈশ্বর লাভের হয়তো কোন সম্ভাবনা ছিলনা কিন্তু সদ্‌গুরু মিলে গেলে তাঁর স্বভাব ও উপদেশে আমরা ঈশ্বরের অনেক কাছে পৌঁছে যেতে পারি।

যুগে যুগে গুরু— যাঁর মধ্যে ভগবানের চিৎশক্তির প্রকাশ— সেই গুরুরূপ ঈশ্বর অবতীর্ণ হন। তিনি জীবের পাপ-তাপ, আধি-ব্যাধি, ক্লেশ-যন্ত্রণা— সবকিছুর ভার গ্রহণ করেন।"

—শ্রীশ্রীমোহনানন্দ ব্রহ্মচারী

"গুরু সাক্ষাৎ পরম ব্রহ্ম"

শ্রীমতী রীণা মুখোপাধ্যায়

শ্রী শ্রী গুরুপূর্ণিমার পুণ্য লগ্নে শ্রী শ্রী গুরুদেবের শ্রী শ্রী চরণে জানাই অন্তরের অনন্ত কোটি প্রণাম। শ্রী গুরুদেবের মুখ নিঃসৃত অবিরাম হরিনাম আকাশে বাতাসে অবিরত ধ্বনিত হয়ে চলেছে। আজ পরম লগনে শুধুই শোনাব শ্রী কৃষ্ণের অমৃত বাণী। কলিযুগে কৃষ্ণ নাম ছাড়া কোনো গতি নেই।

ভগবান শ্রী কৃষ্ণ বলেন, মানুষ সাধারণত তার জন্যই কেঁদে বেড়ায়, যেটা তার কখোনোই ছিল না। পৃথিবীতে আজ অবধি এমন কোনো মানুষের জন্ম হয়নি, যার কোনো দুঃখ কষ্ট নেই। সে গরীব হোক বা ধনীই হোক্। কষ্ট সবাইকে জীবনে ভোগ করতে হয়। এমনকি ভগবান শ্রী রাম, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও নিজেদের জীবনে অসীম দুঃখ কষ্টের সম্মুখীন হয়েছিলেন। কথায় বলে, তুমি যেভাবে এই সংসারকে দেখবে, ঠিক সেই ভাবেই তুমি বাঁচবে। ভগবান বলছেন, তাই সকল পরিস্থিতিতে, তুমি খুশী থাকার চেষ্টা করো। কারণ খুশীই সেই একমাত্র অনুভূতি, যা তোমার যে কোনো পরিস্থিতির বিরুদ্ধে লড়াই করার শক্তি এবং ইচ্ছে দুটোরই যোগান দেবে। সংসারে কষ্ট দেবার মানুষটি যতই ক্ষমতাশালী হয়ে থাকুক না কেন, ঈশ্বরের থেকে ক্ষমতাশালী সে কখনোই হতে পারবে না।

একটা কথা সব সময় মনে রাখতে হবে, জীবনের যে কোনো কঠিন পরিস্থিতি, তোমার নিজের অদম্য সাহসের থেকে বড় কখনোই হতে পারবে না।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেন, একবার যে শিখে নিয়েছে, কখোন্ কোথায় কীভাবে তাকে বলতে হবে, তাকে জীবনে সফল হওয়ার থেকে আর কেউ আটকাতে পারে না। মানুষ কিছুতেই বুঝতে চায়না, তারা যে জিনিস গুলোর পেছনে ছুটে চলেছে, সে গুলো কোনোটাই স্থায়ী নয়। যদি এ সংসারে কোনো কিছু স্থায়ী হয়ে থাকে, তাহলে সেটা হচ্ছে আত্মা। যা আমাদের মনের শান্তি। বাকী সব কিছুই অস্থায়ী। যখন আমরা কোনো খারাপ বা ভালো কাজ করি, তখন মনে হয় কেউ আমাদের দেখছে না। ভগবান বলেন, 'তুমি যাই করো না কেন, আমার নজর সর্বদা তোমার উপর তাই, কখনোই এমনটা ভাবা উচিত নয় যে আমি একা। ঈশ্বর সবসময় আমাদের সঙ্গেই বাস করেন। কথায় বলে, ঈশ্বর দৃষ্টিকে ফাঁকি দেওয়া যায় না। যে মানুষটি সব সময় নালিশ করে, সে কখনো ভালো থাকতে পারেনা। কিন্তু যে মানুষটি তার জীবনের সব কিছুর জন্য কৃতজ্ঞ থাকে, সে কিন্তু কখনোই অখুশী থাকতে পারে না। তার জীবনে সব সময় একটা শান্তি বিরাজ করবে। সময় কখন রঙ বদলায়, কেউ বলতে পারে না।

যেমন প্রভু শ্রী রামচন্দ্রের যে রাতে রাজ্য লাভের কথা ছিল, সেদিন সকালে তিনি বনবাসে গেলেন। ভগবান বলেন— উদাস হয়ে থাকাটা তোমার অভ্যাসে পরিণত হওয়ার আগেই, হাসিখুশি থাকতে শেখো। জীবনটাকে উপভোগ করতে শেখো, বাঁচার মতো বাঁচতে শেখো। কেউ এমনও হয়, যার কাছে সব থাকা সত্ত্বেও সব সময় উদাস থাকে। আবার কেউ এমনও আছে, যার হয়তো কিছুই নেই, কিন্তু তারপরও সে

আনন্দে জীবন কাটায়। আজকাল দুনিয়ায় অতিরিক্ত ভালো মানুষ হয়ে থাকা মোটেও ভালো নয়। কামান থেকে গোলাবারুদ বেরিয়ে গেলে যেমন আর ফিরে আসে না, ঠিক তেমনি মুখ থেকে বেরোনো কথাও কখনো ফেরৎ আনা যায় না। তাই, যখনই মুখটা খুলবে বুঝে শুনে খোলো।

সম্মান এবং প্রত্যাশা কখনোই মানুষের থেকে আশা করা উচিত নয়। কারণ সম্মানটা মানুষের হয় না; হয় প্রয়োজনের। তাই, প্রয়োজন মিটে গেলে সম্মান ও চলে যায়। কিন্তু ভগবানের উপর আস্থা থাকলে ভগবান তাঁর ভক্তদের কখনো একা ছাড়েন না। সবাই মিলে বলি হরে কৃষ্ণ। হরে কৃষ্ণ। "ভুলেও ভুলো না যেন, শ্রীগুরুর শ্রীচরণ, ও চরণে কোটি চন্দ্র বিরাজিত জানেনা। গুরু নাম করো সাধনা।" শ্রী শ্রী গুরুচরণে অন্তরের অনন্ত কোটি প্রণাম। জয় শ্রী শ্রী গুরু মহারাজজী কী জয়।

কাশীতে কয়েকটা দিন: ৪৬ পৃষ্ঠার পরবর্তী অংশ

সম্রাট আকবরের নবরত্ন সভার অন্যতম হিন্দু অর্থমন্ত্রী টোডরমলের সঙ্গে আলাপ হয় কাশীর বেদজ্ঞ পণ্ডিত ও শিবভক্ত সাত্ত্বিক ব্রাহ্মণ নারায়ণ ভট্টের সঙ্গে। নারায়ণ ভট্ট টোডরমলকে দুঃখের সঙ্গে জানান কাশীতে বিশ্বনাথের স্থায়ী মন্দির না থাকার কথা।

টোডরমল সেই কথাটি নিবেদন করেন সম্রাট আকবরের কাছে। অতঃপর আকবরের অর্থানুকূল্যে ১৫৮০ থেকে ১৫৮৫ সালে গড়ে ওঠে বিশ্বনাথের মন্দির।

পরবর্তীকালে সম্রাট আওরঙ্গজেব সেটিকেও ধ্বংস করে সোনাদানা নিয়ে চলে গেলে, ইন্দোরের মহারাণী অহল্যাবাঈ হোলকার ১৭৮০ সাল নাগাদ বর্তমানে বর্তমানের মন্দিরটি নির্মাণ করান। পরবর্তীকালে ১৮৩৬ সালে পাঞ্জাব কেশরী রঞ্জিত সিং মন্দিরের দুটো চূড়া তামার ওপর সোনার পাত দিয়ে মুড়ে দেন। বর্তমানে আমরা এই মন্দিরটাই দেখি। মন্দিরের তিনটি আলাদা চূড়া। মাঝখানেরটি গম্বুজাকৃতি। ইতিমধ্যেই বেশ কিছুটা বৃষ্টি হয়ে গেছে। তীব্র দাবদাহ কিছুটা হলেও কমেছে। পাণ্ডাজীকে বললাম, উল্টোদিকেই মা অন্নপূর্ণার লাল রঙের মন্দির দেখা যাচ্ছে। সেখানে যদি একবার দর্শন করা যায়। আমরা এক নম্বর গেট দিয়ে বের হয়ে এলাম।

মা অন্নপূর্ণার মন্দির লাল পাথরের উঁচু প্রাচীর দিয়ে ঘেরা। কাশীর অন্যান্য মন্দিরের মতই এই মন্দিরও বিধর্মীর অত্যাচারে ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। বিশ্বনাথের মন্দির তৈরীর সময়ই মহারাণী অহল্যাবাঈ হোলকার বর্তমান মন্দিরটি তৈরী করিয়ে দেন। রাজস্থানী লাল পাথরে তৈরী মন্দির। পিতলের পাত দিয়ে মোড়া বিশাল দরজা পার হয়ে মন্দিরে প্রবেশ করলাম। আজ চৈত্র নবরাত্রির পঞ্চমী। তিন দিন বাদে অষ্টমীতে অন্নপূর্ণা পূজা। সমস্ত মন্দির টুনি লাইট দিয়ে সাজানো হয়েছে। মন্দিরে ভক্তদের বেশ ভীড়। বারটি সুন্দর খোদাই করা লাল পাথরের স্তম্ভের ওপর নাট মন্দির। সাদা কালো মার্বেল পাথরের মেঝে। নাট মন্দিরের তিন দিক খোলা।

এখান থেকে দরজার মধ্যদিয়ে ছোট্ট গর্ভ মন্দিরে অধিষ্ঠাত্রী মা অন্নপূর্ণাকে দর্শন করলাম। মায়ের রূপোর মুখটুকুই শুধু দেখা যাচ্ছে। সর্বাঙ্গ বস্ত্রে আচ্ছাদিত। (আমরা পরে অষ্টমীতে অন্নপূর্ণা পূজার দিন আর একবার মা কে দর্শন করে ছিলাম। সেদিন ছিল সোনার মুখ। হাতে সোনার বাটি ও সোনার হাতা। পাশে দণ্ডায়মান রূপোর শিব কে ভিক্ষা দিচ্ছেন।)

পরবর্তী অংশ ৫৬ পৃষ্ঠায়

স্মৃতির পাতা থেকে

শ্রীমতী সোমা মুখোপাধ্যায়

শ্রীশ্রীগুরুমহারাজের অসীম কৃপার কথা প্রকাশের ক্ষমতা আমার মতো একজন ক্ষুদ্র মানবীর পক্ষে অসম্ভব। তবুও তাঁকে ভরসা করে কিঞ্চিৎ শক্তি প্রার্থনা করে আমি এই লেখনী ধরলাম।

"হে প্রভু হে গুরুরূপী নারায়ণ তুমিতো যাওনি চলে আছ, আমাদেরই সবার মাঝে, দিলে স্বপনে দর্শন।" ১৪২৩ সাল ২৫শে পৌষ রাত্রি একটার সময় আমার খুড়ো শ্বশুর মহাশয় মানিক মুখোপাধ্যায় সজ্ঞানে সাধনোচিত ধামে গমন করেছিলেন। প্রচণ্ড ঠাণ্ডা, তার সাথে বৃষ্টি, কাকু বিছানা থেকে নেমে গুরুদেবের শ্রীপাদুকায় মাথা রেখে শেষ নিঃশ্বাস ছেড়েছিলেন।

২০০০ সালে কাকু চাকুরী স্থলে অবসর গ্রহণের পর দীর্ঘ সতেরো বছর ধরে প্রত্যহ ভোরবেলায় স্নান ক্রিয়াদি সেরে নিজহাতে পুষ্পচয়ণ করে ঘরের গুরুপূজা সমর্পন করতেন ও তার পরেই প্রাতঃরাশ সেরে সকাল আটটার মধ্যে পৌঁছে যেতেন নডিহা আশ্রমে।

আশ্রমে যাওয়ার পথে কাকু আশ্রমের সকল দেবদেবীর জন্য ফলমূল ও ভোগরাগের জন্য সবজি ইত্যাদি কিনে নিয়ে যেতেন। দুর্গাপুর আশ্রমের ভোগের ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব কাকুই নিয়েছিলেন আর সেইসঙ্গে ভাঁড়ারেরও দায়িত্ব। আর তাঁর ভাই, মানে আমার শ্বশুরমশাই ছিলেন হিসাব রক্ষক ও সম্পাদনার দায়িত্বে। দুজনেই নিজ নিজ দায়িত্ব খুবই নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করতেন একথা সর্বজন বিদিত।

দুর্গাপুর আশ্রমের প্রতিটি উৎসবের ভাণ্ডারায় পাঁচশত থেকে হাজার দু-হাজার পর্যন্ত ভক্তরা প্রসাদ পান। ২০১৬ সালের অক্টোবর মাস পর্যন্ত কাকু এইসকল আয়োজন খুব নিষ্ঠার সঙ্গে করেছেন। পাশে সহায়ক বলতে দু-চার জন মাত্র থাকতেন। রান্নার সময় রাত জেগে বসে সমস্ত ব্যবস্থাপনা ঠিকঠাক করে চলছে কিনা তা' পর্যবেক্ষণ করতেন। সকলের খাওয়া যাতে সুশৃঙ্খলভাবে হয় সেদিকে ছিল তাঁর তীক্ষ্ণ নজর। সবার শেষে তিনি খুবই অল্প আহার করতেন। উৎসবের দু'দিন পর কাকু, বাবার কাছে এইসকল খরচের হিসাব দাখিল করতেন। তবে বেশকিছুদিন পর পরই কাকু তাঁর শারীরিক অক্ষমতার কথা জানাতেন আবার এটাও বলতেন যে গুরুমহারাজের কাজ তিনি ঠিকই করিয়ে নেন। এইভাবে চলতে চলতে ২০১৬'র ২৬শে নভেম্বর কাকু দুর্গাপুর আশ্রমের বিশিষ্ট কর্মী (মানিক মুখোপাধ্যায়) হঠাৎ ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়েন; ক্রমে বিভিন্নরকম পরীক্ষা-নীরিক্ষায় ধরা পড়ল কাকু লিউকোমিয়ায় আক্রান্ত এবং চিকিৎসা পরিষেবায় আশানুরূপ ফললাভ হচ্ছিল না— ঠিক দেড় মাসের মাথায় তিনি ইহলোকের সকল বন্ধন ছিন্ন করে শ্রীগুরুচরণে লীন হলেন।

আমি বেশ ভালভাবে লক্ষ্য করেছিলাম ইহজগতের শেষ কটাদিন কাকু সদাসর্বদাই শ্রীশ্রীগুরুমহারাজের চরণ স্মরণ মনন করে তাঁর বন্দনা করতেন। আমাকে প্রতিদিন সন্ধ্যা আহ্নিক শেষে শ্রীগুরুর গান ও হরিনাম করতে বলতেন।

তারপর একদিন দুপুরে কাকুর কাছে গিয়ে দেখি তাঁর শরীর এবং মন দুটোই ভারাক্রান্ত। বিষণ্ণ হৃদয়ে, তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থায় শায়িত কাকুর দুগাল বেয়ে অশ্রুবিন্দু গড়িয়ে পড়ছে—আমাকে দেখে ইশারায় পাশে বসতে বললেন, আমি চোখের জল মুছিয়ে দিতে উদ্যত হলে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন; স্বয়ং গুরুমহারাজ এসেছিলেন, ছোটমা (কাকীমা) আর বাড়ির অন্যান্য সবাই শ্রীশ্রীগুরুমহারাজজী আমাদের সকলের কপালে যজ্ঞের টিপ দিলেন কিন্তু কাকুকে দিলেন না। কাকু যখন ভারাক্রান্ত হৃদয়ে করুন চোখে মহারাজের দিকে তাকালেন, শ্রীগুরুমহারাজ তখন কাকুকে বললেন, 'তুমি নিত্য।' এই ঘটনার দিন দুয়েকের মধ্যেই কাকু সজ্ঞানে শ্রীগুরুচরণে স্থান পেয়েছেন। আমাদের শূন্য হৃদয়তো পূর্ণ হবার নয়। ইতিমধ্যে ছোটমাও প্রায় বছর চারেক পূর্বে সজ্ঞানে সাধনোচিত ধামে গুরুগোবিন্দচরণে আশ্রয় পেয়েছেন।

কাকু-ছোটমার চিন্তা-ভাবনা, তাঁদের কর্ম-সাধনা-ত্যাগ-ভালোবাসা— এটাই আমাদের চলার পথে শিক্ষনীয় হয়ে থাকল।

কাশীতে কয়েকটা দিন: ৫৪ পৃষ্ঠার পরবর্তী অংশ

মা পশ্চিম দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে। এখানে একটা কথা বলার আছে। প্রাচীন পুরাণাদিতে কাশীর অধিশ্বরী মায়ের নাম কিন্তু অন্নপূর্ণা ছিল না। ছিল দেবী ভবানী। আচার্য শঙ্করাচার্য বিরচিত প্রথম স্তোত্র ও ছিল ভবান্নস্টক। পরবর্তীকালে তাঁর নাম হয় মা অন্নপূর্ণা। শঙ্করাচার্য অন্নপূর্ণা স্তোস্ত্রও রচনা করেন।

"অন্নপূর্ণে সদাপূর্ণে শঙ্কর প্রাণবল্লভে।
জ্ঞান বৈরাগ্য সিদ্ধার্থং ভিক্ষাং দেহি চ পার্বতি।।"

মা অন্নপূর্ণা কাশীর নবদুর্গার এক জন। নবরাত্রির অষ্টমীর দিনে মা কে দেবী মহাগৌরী হিসাবে পুজো করা হয়। সামনের দরজায় পূজারী বসে আছেন। ভক্তদের আনা ডালা পুজো করিয়ে ফেরত দিচ্ছেন। মালা মা কে পরিয়ে দিচ্ছেন। সামনে রাখা তামার বড় থালা থেকে প্রসাদী হলুদ চন্দন মাখা চাল প্রত্যেকের হাতে দিচ্ছেন। এই প্রসাদী চাল গৃহে রাখলে না কি কোনোদিন অন্নের অভাব হবে না। দেবীর বর্তমান বিগ্রহটি খুব প্রাচীন নয়। ১৯৭৭ খ্রীষ্টাব্দে শৃঙ্গেরীর শঙ্করাচার্য এটি প্রতিষ্ঠা করেন। প্রাচীন বিগ্রহটি ছিল শ্বেত পাথরের ছোট বিগ্রহ। আসন করে বসা। তাঁর দুই হাতে হাঁড়ি ও হাতা। সেই বিগ্রহটি বর্তমানে পাশের রামমন্দিরে তারের জাল দিয়ে ঘেরা ছোট মন্দিরে আছেন।

মন্দিরে একটি বিশাল ঘণ্টা টাঙানো আছে। এটি নেপালের রাণাদের দেওয়া। বিশ্বনাথের মন্দিরে একটি এইরকম বড় ঘণ্টা আছে। অন্নপূর্ণা মন্দির থেকে বেরিয়ে সামনেই ডান হাতে "ঢুণ্ডিরাজ গণেশ"। মাটিতে বসা। চতুর্ভুজ লম্বোদর একটি হাতে লাড্ডু। সুন্দর বালকমূর্তি। লাল সিঁদুর মাখানো সর্বাঙ্গে। আমরা উল্টোদিকের ডালার দোকান থেকে দূর্ব্বা নিয়ে প্রণাম করলাম। প্রণামী রেখে বেরিয়ে এলাম। কথায় বলে পঞ্চক্রোশ পরিমিত এই কাশী শিবময়। কথাতেই আছে "কাশীকা হর কংকর হ্যায় ভোলা শংকর"। আমরা এতদিন স্বামী সারদানন্দের শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণলীলা প্রসঙ্গ থেকে জানতাম ঠাকুর শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ দেব যখন মথুর বাবুর সঙ্গে কাশী গিয়েছিলেন তখন 'বারাণসী কে সর্বদা সুবর্ণময়" দেখে তাকে শৌচাদি করে অপবিত্র না করার জন্য মথুর বাবুকে বলে পালকির বন্দোবস্ত করে অসী নদীর পারে

পরবর্তী অংশ ৫৮ পৃষ্ঠায়

বিশ্বজোড়া ফাঁদ যে তোমার

শ্রীগুরুচরণাশ্রিতা কণিকা পাল

১৯৯৯ সাল থেকে ২০২৪ সাল—পঁচিশ বছর হ'ল; আমরা আমাদের পরমারাধ্য শ্রীগুরুদেবকে স্থূল দেহে পাওয়ার ভাগ্য থেকে বঞ্চিত হয়ে আছি। গুরুদেব বলতেন বছরের প্রতিটা দিনেরই মাহাত্ম্য আছে। হ্যাঁ গুরুবাক্য মানেতো বেদবাক্য। তাঁরই শ্রীমুখনিঃসৃত বাক্য-গুরু, ইষ্ট-মন্ত্র এক।

তিনি শ্রীদেহে থাকতে আমরা কোনদিনই স্বপ্নেও ভাবিনি যে দেহধারী শ্রীভগবানকে আমরা আমাদের আমৃত্যু পাবনা। অবশ্য তাঁর কথাতেই আজ বলছি তাঁর শ্রীমুখেরই সঙ্গীতের বাণী, "গিয়েও আমি যাইনি চলে, আছি তোদের মাঝে..." সত্যিই হিসাবে হয়তো পঁচিশ কিন্তু একদিনের তরেও তিনি আমাদের কাছে নেই এটা আমাদের তিনি ভুলিয়ে রেখেছেন—সদা সর্বদাই তাঁর অনুভূতি, তাঁর বিভূতি, তাঁর নির্দেশ আমরা পেয়েই চলেছি। কবিগুরুর কবিতার লাইনটি মনে পড়ে যাচ্ছে—"মোর লাগি করিওনা শোক..., "নানা শোক নয়, তিনিতো বলেছেন মহাপুরুষের' আবির্ভাব ও তিরোভাব দুই-ই সমানভাবে নিতে হয় "ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা"। আর তাঁর ভজন কীর্তনের মধ্য দিয়ে আমাদের জন্য সর্বরকমের সমাধানের সূত্র তিনি দিয়ে গেছেন। এখন আধার অনুযায়ী আমরা যেভাবে তার প্রয়োগ করব, সেভাবেই সেটি প্রকাশিত বা প্রচারিত হবে।

আজও ভক্তরা তাঁকে চিঠি লিখে সেই আগেরই মত তাঁর শ্রীচরণ যুগলে দিয়ে রাখছে— এমনকী পরীক্ষার রুটিন থেকে বিয়ের কার্ড পর্যন্ত। একবার তিনি তীর্থভ্রমণের পথে তাঁর অনুগামীদের জিজ্ঞেস করেছিলেন ভাদ্রমাসের মাহাত্ম্যের কথা। বেশিরভাগই শ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমীর কথা বলায় শ্রীগুরুমহারাজ বলেছিলেন, আর, "আমি যে বদ্রীনাথে যাই...," তখন কে জানত যে তিনি এই মাসকেই আমাদের জন্য আরও স্মরণীয় করে তুলবেন?

শেষের বার যখন তিনি বোম্বে গিয়েছিলেন, এই অভাগীরও ভাগ্যে সেবার তাঁর সান্নিধ্যলাভের সুযোগ হয়েছিল। এখনও স্পষ্ট মনে আছে ওখানকার দেবুদার বাড়িতে উনি সান্ধ্যভ্রমণের পরে অল্পক্ষণের জন্য যেতে চেয়েছিলেন। এবার অফিস পৌঁছে দেবুদা ফোন করেছিলেন রমামাকে যে এইবারে নয় স্থগিত থাকুক তাঁর বাড়িতে আসাটা। সেই কথা রমামা মহারাজজীকে বলতেই তিনি স্পষ্ট ভাষায় জানালেন, "না না আজই যাব; এরপরে আর হবে না"। কাজেই সেইদিনই তিনি চরণ ধূলি দিয়ে ছিলেন আর হাতে তালি দিয়ে "জয় কৃষ্ণ হরে"— গানটি গেয়েছিলেন।" আজ সেইসব কথা মনে পড়লে 'গা' শিউরে ওঠে।

ভাগলপুরের হরেন দাসের ছেলে কমলদা মহারাজজীকে একটা চিঠি লিখে জানতে চেয়েছিলেন যে— তিনি না থাকলে আমরা কী করব? সেই চিঠিরই পেছনদিকটায় মহারাজজী লিখেদিয়েছিলেন—

"হরর্ণামৈব নামৈব, নামৈব কেবলম্"

তাই গুরুবাক্যের যাতে কোন অবমাননা না হয় সেই জন্য আমরা মাঝে মধ্যেই যে যার গৃহে কীর্তনের আয়োজন করি।

আর তাঁর উপর সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ ও বিশ্বাস, ভক্তি বজায় রাখার চেষ্টা অবিরাম করে চলার চেষ্টা করি।

তিনি যে সম্পূর্ণ গুরুগত প্রাণ ছিলেন তার দৃষ্টান্তও তিনি রেখে গেলেন শ্রীশ্রীগুরুপূর্ণিমাতে বহু ক্লেশ বহু যন্ত্রণা, সহ্য করেও জীবনের শেষ গুরুপূর্ণিমা উৎসবে নিজেকে শ্রীগুরুর শ্রীচরণে দিলেন পুষ্পাঞ্জলি।

আসুন সবাইমিলে গাই—
"এপথের শেষ কোথা নাহি জানি
স্বামী, নিয়ে যাবে সাথে মোহন জীবনস্বামী।
পথ ভুলে যাই, দয়া করে তাই তুমি
মোর সাথে র অ অ হ — হে গুরু
প্রণাম লহ..."।।

কাশীতে কয়েকটা দিন: ৫৬ পৃষ্ঠার পরবর্তী অংশ

(বারাণসীর) বাইরে শৌচাদি সেরে আসতেন। আর এখানে পরদিন সোমবার সংকটমোচন মন্দিরে গিয়ে জানতে পারলাম গোস্বামী তুলসিদাস জীও প্রত্যহ ডিঙি নৌকা করে বারাণসীর অপর পারে গিয়ে শৌচাদি সেরে আসতেন। সংকটমোচন হনুমান মন্দির কাশীর একটি অবশ্য দ্রষ্টব্য স্থান। কথিত আছে গোস্বামী তুলসিদাসজী এই মন্দির ১৬শ শতাব্দিতে প্রতিষ্ঠা করেন। ঈষৎ ঘাড় হেলানো লাল মেটে সিঁদুর মাখানো, প্রায় এক মানুষ সমান মাটির মূর্তি। সংকটমোচনের মুখ যে দিকে ফেরানো সেদিকে মন্দিরে শ্রীরাম, সীতা দেবী ও লক্ষ্মণের মূর্তি। যেন সংকটমোচন প্রভুর দিকে চেয়ে আছেন। ২০০৬ সালের ৭ই মার্চ মন্দিরে পূজা চলা কালীন সন্ত্রাসবাদীরা বিস্ফোরণ ঘটায়। তার পর থেকে মন্দিরে প্রবেশের ক্ষেত্রে কড়াকড়ি। মোবাইল নিয়ে ভেতরে যাওয়া নিষেধ। গেটে মহিলা ও পুরুষদের আলাদা আলাদা লাইনে পরীক্ষা করে প্রবেশ করতে দেওয়া হচ্ছে। আমরা মন্দিরের বাইরে ডালাপ্রসাদের দোকানে চটি জুতো রেখে মালা, সিঁদুর, চামেলি তেল আর সংকটমোচনের প্রিয় বেসনের লাড্ডু প্রসাদ কিনে ভিতরে প্রবেশ করলাম। লম্বা লাইন। বেশ ভীড়। বেশীরভাগই অবাঙালি। কিছু বাঙালি মুখ ও চোখে পড়ল। লাইন দ্রুত এগোচ্ছে। আমাদের লাইন যখন সামনে এলো, পুরোহিত হাত থেকে লাড্ডু ও মালা নিয়ে স্পর্শ করিয়ে ফেরত দিলেন। সঙ্গে দিলেন প্রসাদি তুলসি। মন্দির প্রদক্ষিণ করলাম। সারা মন্দিরটি লাল সিঁদুর মাখানো। মন্দির গাত্রে তাকের ওপর প্রচুর ছোট ছোট হনুমান চালিশা (অবশ্যই হিন্দিতে) ও সুন্দরকাণ্ড রাখা আছে। ভক্তেরা একটা করে তুলে নিয়ে পাঠ করছে। আমরাও একটা একটা হনুমান চালিশা নিয়ে সংকটমোচনের ঠিক সামনাসামনি কুয়োর বাঁধানো চাতালের ওপর উঠে বসে পাঠ করলাম। পাঠ শেষ হলে বই দুটি আবার যথা স্থানে রেখে দিলাম।

তারপর শ্রীরামের মন্দিরে প্রণাম করে বেরিয়ে এলাম।

MOHONANANDA CANCER DIAGNOSTIC & WELFARE SOCIETY
Rangamati path, Bidhannagar, Durgapur-713212, West Bengal
(A DEDICATED CANCER HOSPITAL)

LIST OF DONORS (FOR THE PERIOD 12/02/2024 to 23/05/2024)

DATE	RT. NO.	NAME	AMOUNT (Rs.)
12.02.2024	Foreign Donation	IPSITA DEY, SUPRATIK DEY-USA	206360.00
27-02-2024	592	DR. REBA BANERJEE - KOLKATA	10001.00
04-03-2024	1608	ABHIK CHATTOPADHYAY - KOLKATA	20000.00
04-03-2024	1522	SUKANTA BASAK IN MEMORY OF LT. KARTICK GANGULY - ASANSOL	1500.00
02-04-2024	1593	A WELL WISHER - KOLKATA	3005.00
01-03-2024 to 01-06-2024		P&J CHANDRA FINANCIAL SERVICE PVT. LTD - KOLKATA	8000.00
09-04-2024	1523	PRIYANSH SAMANTA & PIYASI BANERJEE - KALNA	1001.00
09-04-2024	1524	SUPARNA DAN - KESTOPUR	10001.00
25-04-2024 & 16-05-2024		SOMA MITRA	2000.00
29-04-2024	1609	ROMITA BOSE SIRCAR - KOLKATA.	25001.00
06-05-2024	1594	ASHIS SENGUPTA - KOLKATA	500.00
10-05-2024	1595	A WELL WISHER - KOLKATA	1001.00
23-05-2024	1610	DR. LAL PATHLABS LIMITED	20000.00

PLEASE SEND YOUR DONATION:-
For Donation in Indian Rupees:
Name of the Bank Account: **MOHONANANDA CANCER DIAGNOSTIC AND WELFARE SOCIETY.**
Name of the Bank : **STATE BANK OF INDIA, MUCHIPARA BRANCH, DURGAPUR-713212, BURDWAN, ACCOUNT NO. 35626526750, BRANCH CODE: 6888, IFS CODE: SBIN0006888. WEST BENGAL.**

For Donation in Foreign Currency:
Name of the Bank Account: **MOHONANANDA CANCER DIAGNOSTIC AND WELFARE SOCIETY.**
Name of the Bank **STATE BANK OF INDIA, 11, SANSAD MARG, NEW DELHI-110001, BRANCH CODE: 00691 ACCOUNT NO. 40283076692**
SWIFT CODE: SBININBB104, IFS CODE: SBIN0000691, Account Type: **FCRA (Savings).**

সম্পাদকীয়

স্বার্থ—নিঃশর্ত অগ্রসর

সময় চিরপ্রবহমান— অনন্ত অবিচ্ছিন্ন; তবু তাকে আমরা বর্ষ, মাস, দিনে খণ্ডিত করেছি, কেবল সেটাই নয় বাঙালীর বারোমাসে তেরোপার্বণ বলে একটি প্রবচনই আছে। কাল বিভাজন করে বিভিন্ন কালে বিভিন্ন পুজো-পার্বণ-উৎসবাদি যেন লেগেই থাকে আমাদের জীবনে। প্রাকৃতিক পরিবেশও কালের বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন রূপে রূপান্তরিত হয়।

মানবজীবনকেও হিন্দু ধর্মানুসারে চারটে ভাগে ভাগ করা হয়— ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বাণপ্রস্থ এবং সন্ন্যাস, প্রথম আশ্রমটি খুবই তাৎপর্য্যপূর্ণ দেহ-মনের নিয়ম শৃঙ্খলার প্রশিক্ষণ কাল! এই সময়টিকে বলা হয় কৈশোর আর এই খুঁটি পোক্ত না হলে তার উপরের গুলোতো নড়বড়ে হয়ে যাবে। পূর্বে এই শিক্ষা গুরুগৃহে অবস্থান করে নিতে হত। তারপর সামাজিক এবং যৌবন, পরে বাণপ্রস্থ, সবশেষে আধ্যাত্মিক মুক্তির স্তরে এসে পৌঁছায় মানুষ। সেই স্তর হল আবেগ, আসক্তি সবকিছুর ঊর্ধ্বে, সে যেন তখন পরমাত্মার সঙ্গে মিলিত হতে চায়।

সুতরাং মা-বাবার পরে প্রথম শিক্ষা যাঁর কাছ থেকে পায় তিনি হলেন শিক্ষাগুরু, জীবনে তাঁর অবদানতো সবার আগে; পরবর্তীকালে নিজস্বতা অর্জন করে মানবজাতি বুঝতে পারে যে সংসারের মোহমায়া কাটাতে হলে প্রয়োজন হয় দীক্ষাগুরুর। বড়মহারাজজী বলেছেন নদীর উদ্দেশ্য সাগরে মেশা। কিন্তু কার গতি কীরকম হবে, কোন নদী মাঝপথেই শুখিয়ে যাবে আদৌ সাগরে মিলতে পারবে কিনা জানা নেই; সেইরকমই মানবজাতির প্রয়োজন একজন সাধকের কাছে দীক্ষা গ্রহণ করা, যিনি তাঁর সাধন এবং যোগবলে নিজ শিষ্য শিষ্যাকে সেই পরমাত্মারূপী ব্রহ্মের সঙ্গে সংযুক্ত করে দেবেন।

ব্যাসদেব সর্বপ্রথম গুরুরূপে পূজিত হয়েছিলেন যে পূর্ণিমাতে, সেই দিনটিই গুরুপূর্ণিমা বলে প্রত্যেকেই আপন আপন গুরুকে সসম্মানে পুজো করে। প্রথমে ব্যাসদেবের পুজো করা হয়, তারপর নিজ নিজ গুরুর। তাই এই পূর্ণিমাকে 'ব্যাস' পূর্ণিমাও বলে থাকেন অনেকে। সদ্‌গুরুর মাধ্যমেই প্রকটিত হয় ভগবানের কৃপাধারা।

আসুন আমরা শ্রীগুরুর শ্রীচরণে নিজেদের সমর্পন করি— "ভয় হতে তব অভয়ের মাঝে নূতন জনম দাও হে।".....